জানাযা দর্পণ

আবদুল হামীদ ফাইযী

জানাযা দর্পণ

প্রণয়নে ঃ
আব্দুল হামীদ মাদানী

أحكام الجنائز

(باللغة البنغالية)

إعداد : عبد الحميد الفيضي

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

! " ! #$% #$%&(*) +

)6+"'+)6 *& #2 ,"' 7 8 9 / 0&:. 4, ,"') . / 0 1 (#23 , ' $5

@' #<5 (=#$% *) #2 ,"' > 4 6 #? 1 (

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾

ইসলাম যাদের জীবন, কুরআন ও সুন্নাহর আলো-বাতাসে যাদের প্রাণ সজীব তারা নিশ্চয়ই চায় যে, তাদের ঐ ইহকালের শেষজীবন সমাপ্ত এবং পারলৌকিক মধ্যজগতের শুভজীবন আরম্ভ হোক সেই সৌরভময় আলো-বাতাসের মনোরম পরিবেশের মাধ্যমেই। তাইতো সলফগণ তাঁর পরিজনবর্গকে সুন্নাহ ভিত্তিক জানাযাকার্য সমাধা করতে অসিয়ত করতেন।

সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেন, 'আমার জন্য বগলী কবর খনন করো এবং কাঁচা ইঁট থাকিয়ে দিও। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য করা হয়েছিল।' *(মুসলিম ৬০৬ক, নাসাঈ ১৯৮০ক, বাইহাকী)*

আবু মূসা ﷺ তাঁর শেষ শয্যায় বলেন, 'যখন তোমরা আমার জানাযা নিয়ে যাবে তখন শীঘ্রতার সাথে চলো। (আগর কাষ্ঠ জ্বালাবার পাত্র) ধুনুচি নিয়ে আমার অনুগমন করো না, কবরের ভিতর আমার লাশ ও মাটির মাঝে কোন বস্তুর অন্তরাল রেখো না, আমার কবরের উপর (গৃহাদি) নির্মাণ করো না। আর

আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি প্রত্যেক (মসীবত ও শোকের সময়) কেশ মুন্ডনকারিণী, উচ্ছরোলে বিলাপকারিণী এবংবস্ত্র বিদীর্ণকারিণী হতে সম্পর্কহীন।' লোকেরা বলল, 'আপনি এ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন কি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি।' *(মুসনাদে আহমাদ ১৮৭২৬ক, বাইহাকী ৩/৩৯৫)*

হুযাইফাহ ؓ বলেন, 'আমি মারা গেলে কাউকে খবর দিও না। কারণ, আমি আশঙ্কা করছি যে, তা মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার পর্যায়ভুক্ত হবে। আর আমি রসূল ﷺ-কে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা নিষেধ করতে শুনেছি।' *(তিরমিযী ৯০৭ক, ইবনে মাজাহ ১৪৬৫ক, আহমাদ ২২৩৫৮ক, সহীহ তিরমিযী ৭৮৬নং)*

আমর্ বিন আল-আস ؓ তাঁর অসিয়তে বলেন, 'আমি মারা গেলে যেন আমার জানাযার সাথে কোন মাতমকারিণী এবং কোন প্রকারের আগুন না থাকে।' *(মুসলিম, আহমাদ)*

আবু হুরাইরা ؓ তাঁর অন্তিম বিদায়ের সময় বলেন, 'আমার কবরের উপর যেন তাঁবু স্থাপন করো না এবং ধুনুচি (বা আগুন) সহ আমার অনুগমন করো না।' *(মুসনাদে আহমাদ)*

সুতরাং অনুরূপ অসিয়ত তাঁদের অনুসারীদেরও করা উচিত। যাতে তাদের জানাযার কাজ সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সম্পন্ন হয় এবং কোন প্রকারের কুসংস্কার ও বিদআত যেন এই কাজে স্থান না পায়।

এই পুস্তিকা লিখে আমি নিজের জন্য এবং সকল মুসলিম ভাইদের জন্য, সকল মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্যে সেই অসিয়ত করারই প্রয়াস পেয়েছি। আর আশা করছি যে, পাঠক মাত্রই এই অসিয়ত পালনে কার্পণ্য ও কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

আল হামদুলিল্লাহ! মানুষ এখন বড় সচেতন। ধর্মীয় চেতনা এবং সঠিক ও সত্য জানার একান্ত অনুপ্রেরণা প্রায় সকলের মনে। তাইতো বিনা হাওয়ালার বই-পুস্তক পড়তে ও মানতে চান না। কিন্তু ফেঁসে যান সেখানেই, যেখানে গলদ, অচল, দুর্বল প্রভৃতি হাওয়ালা মানতে বাধ্য হন। কারণ এসব চেনার ক্ষমতা সকলের নেই। সুতরাং ব্যক্তিত্বের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখতেই হচ্ছে।

আরব জাহানের সত্যানুসন্ধিৎসা সকলের মনে। গবেষণা কেন্দ্রও সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে দ্বীনী রিসার্চ বহু সত্যের সন্ধান দেয়, বহু রহস্য উদ্ঘাটন

করে এবং সংস্কারের নামে বহু কুসংস্কারের পর্দা উন্মোচন করে। দুটি পরস্পর-বিরোধী হাদীসের কোনটি মান্য, পরস্পর-বিরোধী ইমাম ও উলামাদের কোন কথাটি বলিষ্ঠ, যুক্তিযুক্ত ও আমলযোগ্য ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক অভিমত প্রদান করে। যেহেতু ইসলামী শরীয়তে বিশেষ করে আহকামে বহু মতানৈক্য সেই সাহাবা ﷺদের যামানা থেকেই চলে আসছে। এর মধ্যে কোন্‌টি রহিত, কোন্‌টি নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট, কোন্‌টি রূপক, কোন্‌ হাদীসটি জাল বা দুর্বল, একজন দুর্বল ও অপরজন সবল বললে ন্যায় ও যুক্তির মানদন্ডে কার কথাটি বলিষ্ঠ ইত্যাদি বিবেচনা করে নতুন নতুন গ্রন্থাদি প্রণয়ন করা হচ্ছে। যা ঘাড় পেতে মেনে নিতে সাধারণ মুসলমানদের আর কোন দ্বিধা থাকতে পারে না এবং যশ ও পদ-লোভ ছাড়া আর কোন বাধা থাকতে পারে না। সত্যের উত্তাপ পাওয়ার পরও আর কারো অন্ধানুকরণে 'ফ্রোজেন' থাকা সাজে না।

এই সংস্কারকে আমরা সাদর স্বাগত জানাই এবং মনে করি যে, এই সংস্কার সাধনেই রয়েছে মুক্তি; অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি। আল্লাহর গযব ও আযাব থেকে মুক্তি।

আমাদের জ্ঞান সীমিত হলেও 'জেনে পৌঁছে দেওয়া'র দায়িত্বভার মস্তক উপরে। যা হাল্কা করা অনিবার্য কর্তব্য। তাই তো আমাদের এই পদক্ষেপ। বহু কিছু নতুন লাগলেও তা না জানার কারণে নতুন, অনেক কিছু অবান্তর লাগলেও সেটাই নতুন গবেষণায় সত্য ও বাস্তব।

এ কথা মেনে নেওয়ার জন্যই উদারচিত্ত ও উন্মুক্ত মনের সুধীজনদের নিকট আমাদের পুনঃপুনঃ আবেদন। তাই ছোট-খাট বিতর্কিত বিষয়ে ইজতিহাদী (বুঝার ফের নিয়ে) বিতর্ক থেকে গেলেও তা মুক্ত মনে গ্রহণ করা অথবা তাকে বিরাট আকার দান করে সে প্রসঙ্গে মূল্যবান সময় ব্যয় না করাই সকলের কর্তব্য।

অত্র পুস্তিকা সেই সত্যানুসন্ধানী মনীষীদের মেহনতেরই সুপক্ক ফল, যা আমি তাঁদের পুস্তক বাগিচা হতে চয়ন করে আমার এই পুস্তিকা ডালিতে সংগ্রহ করেছি। এতে যে সমস্ত হাদীসের হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে তার সবগুলিই সহীহ। যয়ীফ হলে তা ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁদের হাদীসলব্ধ জ্ঞান ও মতামতের স্থানে তাঁদের পুস্তকের হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। প্রায় সকল স্থানেই

হাওয়ালায় খন্ড-পৃষ্ঠা ও হাদীস-নং ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য শুরুর দিকে অধিকাংশ হাদীসের হাওয়ালায় কম্পিউটারে ব্যবহৃত নম্বরের অর্থে (ক) ব্যবহার করা হয়েছে। সময়ের অভাবেই এই আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অত্র পুস্তিকা দ্বারা জরাজীর্ণ সমাজে মৃত্যু ও জানাযা বিষয়ক কর্মাকর্মে নব জাগরণ ও সংস্কার এলে শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, তিনি যেন এই পুস্তিকার উদ্যোক্তা (শ্রদ্ধেয় ভাই মাষ্টার সিরাজুল হক সাহেব), প্রকাশক এবং আমার মেহনতকে কিয়ামতে নেকীর পাল্লায় রাখেন এবং এর দ্বারা মুসলিম সমাজকে সম্যক্ উপকৃত করেন।

বিনীত -
আব্দুল হামীদ ফাইযী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
৭/৯/১৯৯৬

মৃত্যু প্রসঙ্গে অমোঘ বাণী

মৃত্যু এ জাগতিক সংসারে এক অবধারিত, অনিবার্য ও ধ্রুব সত্য। 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথায় ভবে?' জীবন-মৃত্যুর সৃষ্টিকর্তার নিজস্ব ঘোষণাঃ-

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ ﴾

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্তা), যিনি মহিমাময় মহানুভব।" *(কুঃ ৫৫/২৬-২৭)* "আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল, বিধান তো তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যানীত হবে।" *(কুঃ ২৮/৮৮)* "জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আর কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম, আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(কুঃ ৩/১৮৫)* "জীব মাত্রই মরণশীল; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" *(কুঃ ২৯/৫৭)* "বল 'মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।" *(কুঃ ৩২/১১)* মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যসত্যই আসবে, এ তো সেই বস্তু যা হতে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছ।" *(কুঃ৫০/১৯)* "বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন করতে চাও, তোমাদেরকে সে মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে।" *(কুঃ৬২/৮)*

এইভাবে কুরআন মাজীদে বিভিন্ন ভাবভঙ্গিমায় ১৬৪ স্থানে মরণের কথা আলোচিত হয়েছে। সেই সর্বগ্রাসী তিক্তময় সন্ধিক্ষণ! যার আগমনে সন্তান অনাথ হয়, স্ত্রী বিধবা হয়, পিতামাতা হয় নয়নমণি-হারা এবং বিগলিত হয় সহস্র অশ্রুধারা। কি সে বিষাদ ও বিরহের মুহূর্ত! যা হতে মানুষ একেবারে উদাসীন ও বিস্মৃত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ﴾

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে; যতক্ষণ না তোমরা কবরের সম্মুখীন হয়েছো। না, এ সঙ্গত নয়। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে----- " *(কুঃ ১০২/১-২)*

অতএব "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করো না।" *(কুঃ ৪/৭৮)*

হ্যাঁ, আর এ কথাও জেনে রেখো যে, "তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।" *(কুঃ ৪/৭৮)*

সুতরাং মরণের করাল কবল হতে এবং হিসাবের হাত হতে বাঁচার কোন উপায়ন্তর নেই। এর জন্য রইল কাল জয়ী চ্যালেঞ্জ, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।" *(কুঃ ৩/১৬৮)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "সকল প্রকার সুখ আনন্দ ও সুখহরণ মৃত্যুকে তোমরা অধিকাধিক স্মরণ কর।" *(তিরমিযী, নাসাঈ)*

"দুনিয়ার সাথে আমার কি সাথ? তাঁর শপথ যাঁর হস্তে আমার প্রাণ আছে! আমার ও দুনিয়ার উপমা তো একজন পথিকের (ও বৃক্ষের) ন্যায়, যে, রৌদ্রতপ্ত দিবসে পথ চলতে একটি বৃক্ষের নিচে ক্ষণেক তার ছায়া গ্রহণ করে। অতঃপর তা ত্যাগ করে প্রস্থান করে।" *(আহমাদ, হাকেম)*

"যেখানেই তুমি থাক হে মানব যত হও সাবধান,
মৃত্যু তোমাকে ধরে নেবে ঠিক পাবে না পরিত্রাণ।
মিছে ছলনায় বাঁধলি যে ঘর সে তো নয় তোর কভু,
হায়রে অবোধ আজো কি নিজেরে চিনিতে পারিলি তবু?"

মরণকে স্মরণ

দুনিয়ায় চিরদিন কেউই থাকবেনা, একদিন মরতেই হবে এবং যে কোন সময়ে মরণ আসতে পারে এ কথার স্মরণ মুমিনকে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করে, আর অস্থায়ী ধোকাবাজ ধুলির ধরাতে ও মায়াময় সংসারে উদাসীন, ভোগমত্ত ও বিভোর হতে সুদূরে রাখে। মরণের স্মরণ মুমিনকে আত্মসমীক্ষা তথা বারবার তওবা করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে দ্বীনদারী ও ঈমানদারীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে।

বারা' বিন আযেব ﵁ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একদল লোক দেখতে পেয়ে বললেন, "কি ব্যাপারে ওরা জমায়েত হয়েছে?" কেউ বলল, 'একজনের কবর খোঁড়ার জন্য জমায়েত হয়েছে।' একথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ ঘাবড়ে উঠলেন। তিনি তড়িঘড়ি সঙ্গীদের ত্যাগ করে কবরের নিকট পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। তিনি কি করছেন তা দেখার জন্য আমি তাঁর সামনে খাড়া হলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। পরিশেষে তিনি এত কাঁদলেন যে, তার চোখের পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে বললেন, হে আমার ভাই সকল! এমন দিনের জন্য তোমরা প্রস্তুতি নাও।" *(বুখারী, তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৫, আহমাদ ৪/৩৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৫১ নং)*

হযরত উসমান ﵁ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এত কাঁদা কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। কেউ তাঁকে বলল, 'জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনাকালে আপনি তো কাঁদেন না, আর এই কবর দেখে এত কাঁদছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পরকালের (পথের) মঞ্জিলসমূহের প্রথম মঞ্জিল হল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মঞ্জিলে নিরাপত্তা লাভ করে তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখানে নিরাপত্তা লাভ না করতে পারে তবে তার পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আরো কঠিনতর হয়।"

আর তিনি একথাও বলেছেন যে, "আমি যত দৃশ্যই দেখেছি, সে সবের চেয়ে

অধিক বিভীষিকাময় হল কবর!” *(সহীহ তিরমিযী ১৮৭৮, ইবনে মাজাহ ৪২৬৭ নং)*

আবু দারদা ﷺ বলেন, “তিনটি বিষয় চিন্তা করে আমার হাসি আসে এবং তিনটি বিষয় মনে করে আমার কান্না আসে। যা আমাকে হাসায় তা হল; সেই ব্যক্তি যে, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষী অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজে গাফেল ও উদাসীন অথচ সে দৃষ্টিচ্যুত ও বিস্মৃত নয়। (অথচ তার মৃত্যু আসবে এবং হিসাব নেওয়া হবে।) আর যে, মুখভর্তি হাসে অথচ জানে না যে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, নাকি ক্রোধান্বিত।

আর যা আমাকে কাঁদায় তা হল, প্রিয়তম মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সহচরগণের বিরহ, মৃত্যু যন্ত্রণায় সেই কঠিন ভয়াবহতার স্মরণ, আর সেই দিনে আল্লাহর সামনে খাড়া হওয়ার কথা যেদিনে মানুষের গুপ্ত যত কিছু সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। অতঃপর জানতে পারে না যে, তার শেষ পরিণাম জান্নাত না জাহান্নাম।

এক যাহেদ (সংসার-বিরাগী)কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সবচেয়ে ফলপ্রসূ ওয়ায ও উপদেশ কিসে লাভ হয়? উত্তরে তিনি বললেন, ‘মৃতব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাতে।’

উমার বিন আব্দুল আযীয আওযায়ীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘---পর সমাচার এই যে, যে ব্যক্তি অধিক অধিক মরণকে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বল্প উপকরণ (ধন-সম্পদ) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।’

আত্বা বলেন, ‘উমার বিন আব্দুল আযীয প্রত্যেক রাত্রে ফকীহগণকে সমবেত করতেন এবং সকলে মিলে মৃত্যু, কিয়ামত ও আখেরাতের কথা আলোচনা করে কাঁদতেন।’

সালেহ মুর্রা বলতেন, ‘সামান্য ক্ষণ মরণকে বিস্মৃত হলেই আমার হৃদয় মলিন হয়ে যায়।’

দাক্কাক বলেন, ‘যে ব্যক্তি মরণকে স্মরণ করে সে তিনটি উপকার লাভ করে; সত্বর তওবা, স্বল্পে তুষ্টি, আর আলস্যহীন ইবাদত। পক্ষান্তরে যে মরণের কথা ভুলেই থাকে সেও তিনটি জিনিস সত্বর লাভ করে; তওবায় দীর্ঘসূত্রতা, যথেষ্ট সব কিছু পেয়েও অতৃপ্তিবোধ এবং ইবাদতে অলসতা।’

মরণাপন্ন ব্যক্তিকে দর্শন করা, মৃত্যু যন্ত্রণায় তার কঠিন ভয়ানক কাতরতা

লক্ষ্য করা এবং মরণের পরে মৃতব্যক্তির সেই করুণ মুখ-দৃশ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করায় হৃদয়ের সকল ভোগেচ্ছা উড়ে যায় এবং মনের সকল বাসনা ও উল্লাস উবে যায়। এর ফলে মানুষ সুগভীর নিদ্রা ত্যাগ করে চক্ষু মুছে উঠতে পারে, শরীরের জন্য অতিরিক্ত আরামকে হারাম করে। শুরু করে নেক আমল দ্বারা প্রস্তুতি নিতে এবং বৃদ্ধি করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে তার পরিশ্রম ও প্রয়াস।

হাসান বাসরী (রঃ)এর ব্যাপারে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি এক রোগীকে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখলেন, তার মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুকালীন তার ঐ যন্ত্রণা ও কঠিন কষ্ট দেখার পর যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন তাঁর দেহের রঙ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির লোকে বলল, আল্লাহ আপনাকে রহম করুক! খানা তো খেয়ে নিন।' তিনি বললেন, 'হে আমার পরিজনবর্গ! তোমরা তোমাদের খানা খেয়ে নাও। কারণ আজ আমি এমন বিপদ সঙ্কট দর্শন করেছি; যার জন্য তা আমার নিকট পৌঁছনো পর্যন্ত একাধারে আমল করে যাব।' *(আত্‌তাযকিরাহ, কুরতুবী ১২ পৃঃ)*

কথিত আছে যে, তিনি এক জানাযায় শরীক হয়ে একজন লোককে উদ্দেশ্য করে এবং কবরে রাখা লাশের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'দেখ, ওকে কবরে একটু পরে প্রশ্ন করা হবে আর ও উত্তর দেবে। অতঃপর ওকে যদি দুনিয়ায় পুনরায় আসতে দেওয়া হয়, তাহলে কি ও ভালো কাজ করবে? লোকটি উত্তরে বলল, 'অবশ্যই করবে।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি তো এখন দুনিয়াতেই আছ, তুমি ভালো কাজ করে যাও।'

মরণকে বরণ করবে না এমন কে আছে? আজ অথবা কাল সকলের জীবনের সেই বাতি নিভে যাবে। মানুষ মরণকে স্মরণে না রাখলেও মরণ কোন দিন তাকে ভুলে যাবে না। অচিরেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে পরপারের চির সুখ সাগরে অথবা দুঃখ পাথারে।

সুতরাং জ্ঞানী মাত্রই বিপদ স্মরণ করে তার হাত থেকে মুক্তির উপায় ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে উঠে পড়ে লাগে। পক্ষান্তরে উদাসীন খালি হাতে থেকে বিপদের পঞ্জায় নিজেকে সঁপে দেয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, সর্বসুখ-বিনাশী মৃত্যুকে তোমরা অধিকাধিক স্মরণ কর।

(তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ) কারণ, যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটে তা স্মরণ করবে সে ব্যক্তির জন্য সে সঙ্কট সহজ হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তা কোন সুখের সময়ে স্মরণ করবে সে ব্যক্তির জন্য সুখ তিক্ত হয়ে উঠবে।" *(বাইহাকী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২১০-১২১১নং)*

আসল ঠিকানা

"পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরণ এক দিন মুছে দেবে সকল রঙ্গিন পরিচয়।
মিছে এই মানুষের বন্ধন
মিছে মায়া স্নেহ প্রীতি ক্রন্দন
মিছে এই জীবনের রঙ্ধনু শত রঙ
মিছে এই দু'দিনের অভিনয়।
পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়।।
মিছে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব
মিছে গান কবিতার ছন্দ
মিছে এই অভিনয় নাটকের মঞ্চে
মিছে এই জয় আর পরাজয়।
পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়,
মরণ এক দিন মুছে দেবে সকল রঙ্গিন পরিচয়।।"

****

"ভেবে দেখ ওরে মন!
এ সংসার এক পান্থশালা,
একদল আসে হায়
অন্যদল চলে যায়
স্বার্থপূর্ণ এ জীবন
দু'দিনের খেলা।"

রোগীর কর্তব্য

কেউ ব্যাধিগ্রস্ত ও অসুস্থ থাকলে প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তাকে দেখা করতে যাওয়া এবং বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা, সাহস ও ধৈর্যধারণে উৎসাহ দেওয়া। এটা প্রত্যেক মুসলিমের অপরের নিকট হতে প্রাপ্য অধিকার; যা পালন করলে অজস্র পুণ্য লাভ হয়ে থাকে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে; সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জওয়াবে (আলহামদু লিল্লাহ বলা শুনলে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।" *(বুখারী ১২৮০নং, মুসলিম ২১৬২নং)*

"মুসলিম যখন তার কোন মুসলিম (রোগী) ভাইকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যায় তখন তার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে অবস্থান করে।" *(মুসলিম ২৫৬৮নং)*

কোন মুসলিম সকালে কোন মুসলিম (রোগীকে) সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশ্তা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর সন্ধ্যা বেলায় সাক্ষাৎ করলে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশ্তা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং জান্নাতে তার জন্য এক বাগান রচনা করা হয়।" *(তিরমিযী ৯৮৩নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১১৮৩নং)*

যেমন রোগীর উচিত, আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরে সন্তুষ্ট থাকা, নিজের ভাগ্যের মসীবতে ধৈর্য রাখা এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা যে, আল্লাহর রহমত ও করুণা অসীম, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন ইত্যাদি। কারণ আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখা ছাড়া অন্য অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে।" *(মুসলিম ২৮৭৭, ইবনে মাজাহ ৪১৬৭ নং)*

তবে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশা করার সাথে সাথে স্বকৃত পাপের শাস্তির আশঙ্কা ও ভয় তার মনে অবশ্যই থাকবে। হযরত আনাস ﷺ বলেন, "একদা নবী ﷺ একজন মরণাপন্ন যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, "কেমন লাগছে তোমাকে?" যুবকটি বলল, 'আল্লাহর কসম; হে

আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি আল্লাহর (রহমতের) আশাধারী। তবে স্বকৃত পাপের ব্যাপারেও ভয় হচ্ছে।'

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এহেন অবস্থায় যে বান্দারই হৃদয়ে আল্লাহর রহমতের আশা ও আযাবের ভয় পাশাপাশি থাকে, সে বান্দাকেই আল্লাহ তার আকাঙ্খিত বস্তু প্রদান করে থাকেন। আর যা সে ভয় করে তা হতে তাকে নিরাপত্তা দান করেন।" *(তিরমিযী ৯৯৪, ইবনে মাজাহ ৪২৬১, সহীহ তিরমিযী ৭৯৫ নং)*

রোগ ও পীড়া যত বেশীই যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন তবুও মৃত্যুকামনা করা রোগীর কোনক্রমেই উচিত নয়। কেন না, উম্মুল ফায্ল (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূলের চাচা পীড়িত হলে তিনি তাঁর নিকট এলেন। আব্বাস মৃত্যুকামনা প্রকাশ করলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "হে চাচাজান! মৃত্যু কামনা করেন না। কারণ, আপনি নেক লোক হলে এবং হায়াত বেশী পেলে বেশী-বেশী নেকী করে নিতে পারবেন; যা আপনার জন্য মঙ্গলময়। আর গোনাহগার হলে এবং বেশী হায়াত পেলে আপনি গোনাহ থেকে তওবা করার সুযোগ পাবেন, সুতরাং তাও আপনার জন্য মঙ্গলময়। অতএব মৃত্যুকামনা করেন না।" *(হাকেম ১/৩৩৯, আহকামুল জানায়েয, আলবানী ৪ পৃঃ)*

তাই রোগীর উচিত, অধিকাধিক তওবা-ইস্তিগফার করা এবং অনুশোচনার সাথে আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া। রোগযন্ত্রণায় ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর নিয়ে রাজী থেকে এ কথা বিশ্বাসে রাখা যে, রোগজনিত পীড়া ভোগান্তির প্রতিদান সে অবশ্যই লাভ করবে। আর উচিত, যথাসম্ভব শেষ সুযোগে নেক কাজ করতে বেশী প্রয়াসী হওয়া।

কিন্তু যদি একান্তই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হয় এবং মরণ চাইতেই হয়, তাহলে এই দুআ বলে চাওয়া উচিত,

' ! #$&

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আহ্য়িনী মা কা-নাতিল হায়াতু খাইরাল্ লী অতাওয়াফ্ফানী ইযা কা-নাতিল অফা-তু খাইরাল্ লী।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে মরণ দাও। *(বুখারী ৫৬৭১, মুসলিম ২৬৮০ নং)*

উল্লেখ্য যে, পীড়ার তাড়না বা মানসিক যন্ত্রণার চাপে আত্মহত্যা করা মহাপাপ। আত্মঘাতীর জন্য রয়েছে মহাশাস্তির ঘোষণা। যে যে ভাবে আত্মহত্যা করবে তাবে ঠিক সেই ভাবেই জাহান্নামে কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে সর্বদা চিরকাল ধরে অনুরূপ ঝাঁপ দিতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে সর্বদা চিরকাল ধরে হাতে বিষ নিয়ে পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি ছুরি দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে সর্বদা চিরকালের জন্য হাতে ছুরি নিয়ে নিজ পেটে আঘাত করতে থাকবে। *(বুখারী ৫৭৭৮নং)*

মৃত্যুর সময় যখন নিকটবর্তী হয়, তখন বহু মানুষ বুঝতে পারে যে, এবার তার আর সময় নেই। সুতরাং জ্ঞানী ও সৎ সেই ব্যক্তি; যে তা বুঝতে না পারলেও মরণের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। সর্বদা ধ্যানে-মনে রাখে ইবনে উমার ﷺ-এর এই কথা, 'সন্ধ্যা হলে তুমি আর সকাল হওয়ার ভরসা করো না এবং সকাল হলে আর সন্ধ্যার ভরসা করো না---।' *(বুখারী, মিশকাত ১৬০৪ নং)* বরং পরপারের সেই পরম সুখ ও অনাবিল শান্তির আশায় ও লোভে পথের উৎকৃষ্ট পাথেয় সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হয়। কারণ, মরণের পর ঈমান ও আমল ছাড়া আর কিছু উপকারে আসতে পারে না। পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "তিনটি জিনিস মরণ-পথের পথিকের অনুগমন করে; তার পরিজন, আমল এবং ধন-সম্পদ। কিন্তু দুটি জিনিস (মধ্যপথ হতে) ফিরে আসে এবং অবশিষ্ট একটি তার সঙ্গ দেয়; তার পরিজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল (কৃতকর্ম) তার সাথী হয়।" *(বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০নং)*

মরণের প্রস্তুতি স্বরূপ কারো কাছে ঋণী থাকলে সম্ভব হলে পরিশোধ করে দেবে। কারো অধিকার ছিনিয়ে থাকলে, কারো হক আত্মসাৎ করে থাকলে অথবা কারো প্রতি কোন অন্যায় ও অত্যাচার করে থাকলে তার অধিকার ফিরিয়ে দেবে এবং তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে। নচেৎ সেদিন ভীষণ পস্তানি হবে যেদিন এর পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগকারী ব্যক্তিকে তার নেকী থেকে প্রাপ্য হক প্রদান করা হবে। আর নেকী নিঃশেষ হলে বা না থাকলে

তাদের গোনাহ নিয়ে এই ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সেদিন আসার পূর্বে পূর্বে কারো উপর যদি তার কোন ভায়ের দেহ, সম্ভ্রম বা সম্পদের অধিকার ও যুলুম থেকে থাকে, তবে তা সে যেন তা আদায় করে প্রতিশোধ দিয়ে দেয় যেদিন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সার মাধ্যমে মুক্তিপণ) গ্রহণ করা হবে না। বরং তার (ঐ অত্যাচারীর) কোন নেক আমল থাকলে তা ছিনিয়ে নিয়ে তার প্রতিবাদী (অত্যাচারিত ব্যক্তি)কে প্রদান করা হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে, তাহলে তার প্রতিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ২৪৪৯নং, মুসনাদে আহমাদ ২/৫০৬, বাইহাকী ৩/৩৬৯)*

কোন অসুবিধার কারণে কারো প্রাপ্য হক পরিশোধ করতে অক্ষম হলে রোগী তার ওয়ারেসীনদের অসিয়ত করে যাবে; যেন তারা তার মৃত্যুর পর তা আদায় করে দেয়। জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, "উহুদ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলে রাত্রিকালে আমার আব্বা আমাকে ডেকে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে যে, নবী ﷺ এর সাহাবাবর্গের মধ্যে যাঁরা খুন হবেন তাঁদের মধ্যে আমি প্রথম। আল্লাহর রসূল ﷺ ছাড়া আমার সবচেয়ে প্রিয়তম জিনিস আমি তোমাকেই ছেড়ে যাব। আমার কিছু ঋণ আছে, তা তুমি পরিশোধ করে দিও। আর ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।' অতঃপর সকাল হলে দেখলাম, তিনিই প্রথমে খুন হয়েছেন।" *(বুখারী ১৩৫১নং)*

প্রয়োজনীয় অসিয়ত যতশীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করা বা লিখে দেওয়া কর্তব্য। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিমের জন্য সমীচীন নয় যে, তার অসিয়ত করার কিছু থাকলে তা লিখে মাথার নিকট প্রস্তুত না রেখে সে দুটি রাত্রিও অতিবাহিত করে।" হযরত ইবনে উমার ﷺ বলেন, "আমি যখন থেকে নবী ﷺ-এর নিকট উক্ত কথা শুনেছি, তখন থেকে আমার নিকট অসিয়ত প্রস্তুত না রেখে একটি রাত্রিও যাপন করিনি। *(বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ১৬২৭নং)*

যে সকল নিকটাত্মীয় রোগীর মীরাস থেকে বঞ্চিত (যেমন অন্য ছেলের বর্তমানে মৃত ছেলের ছেলেরা তাদের নামে (উইল) করা ওয়াজেব। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ

وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায় সঙ্গত অসিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। মুত্তাকীদের পক্ষে তা অবশ্য পালনীয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮০ আয়াত)*

কিন্তু মীরাসের আয়াতে যথানির্ধারিত ভাগ পিতা-মাতা এবং অন্যান্য ওয়ারেস আত্মীয়দেরকে প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং এ বিধান কেবল তাদের জন্য বহাল আছে যারা মীরাস থেকে বঞ্চিত। *(তফসীরে সা'দী ৬৮ পৃঃ)*

তবে উক্ত অসিয়ত যেন রোগীর এক তৃতীয়াংশ জমি বা সম্পদ থেকে হয়। কারণ, এক তৃতীয়াংশের অধিক মালে অসিয়ত করা বৈধ নয়। বরং তার চাইতে আরো কম হলে সেটাই উত্তম। সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ বলেন, আমি বিদায়ী হজ্জের সফরে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সেখানে এমন ব্যাধিগ্রস্ত হলাম যাতে আমি নিজেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী মনে করলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে দেখা করতে এলে আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার ধন-মাল তো অনেক বেশী। আর একটি কন্যা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি কি আমার দুই তৃতীয়াংশ মাল অসিয়ত করতে পারি?' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তবে অর্ধেক মাল?' বললেন, "না।" 'তাহলে এক তৃতীয়াংশ?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ এক তৃতীয়াংশ করতে পার। তবে এক তৃতীয়াংশও বেশী। হে সা'দ! তুমি তোমার ওয়ারেসীনদেরকে লোকদের নিকট হাত পেতে খাবে এমন দরিদ্র অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে ধনীরূপে ছেড়ে যাওয়া অনেক ভালো।" *(বুখারী ১২৯৫, মুসলিম ১৬২৮নং প্রমুখ)*

অসিয়ত করার ব্যাপারে দুইজন দ্বীনদার মুসলিমকে সাক্ষী মানা জরুরী। সেরূপ কোন মানুষ না পেলে ২জন বিশ্বস্ত অমুসলিম ব্যক্তিকেও সাক্ষী রেখে নিতে হবে। যাতে সন্দেহ ও মতবিরোধের সময় তাদের সাক্ষ্য দ্বারা নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ ﴾ !4A(*

অর্থাৎ, হে ইমানদারগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয় তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের (অমুসলিমদের) মধ্য হতে দুজন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাযের পর তাদেরকে অপেক্ষমাণ রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা ওর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না - যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয় পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।' তবে যদি এ প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য হতে নিকটতম দুজন তাঁদের স্থলবর্তী হবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের হতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নি, করলে অবশ্যই আমরা যালেমদের দলভুক্ত হব।' *(সূরা মায়েদাহ ১০৬-১০৭ আয়াত)*

সতর্কতার বিষয় যে, যারা ওয়ারেস হবে তাদের নামে যেমন, পিতা-মাতা পুত্র বা কন্যা অথবা বিবির নামে অসিয়ত করা (জমি-জায়গা লিখা) এবং কোন ওয়ারিস (যেমন, বিবাহিত কন্যা বা স্ত্রী)কে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত বৈধ নয়।" *(আবু দাউদ ২৮৭০, তিরমিযী, ২১২০, সহীহ আবু দাউদ ২৮৯৪নং প্রমুখ)*

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তাতে তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক। প্রত্যেকের জন্য এক নির্ধারিত অংশ রয়েছে। *(সূরা নিসা ৭আয়াত)*

আল্লাহ তাআ'লা মীরাসের আয়াতের শেষ অংশে বলেন,

﴿ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴾

অর্থাৎ, --- এ ছাড়া যা অসিয়ত করে তা দেওয়া এবং ঋণ পরিশোধের পর যদি এ কারো জন্য হানিকর না হয়। এ হল আল্লাহ নির্দেশ, বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। *(সূরা নিসা ১২ আয়াত)*

সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত করা অন্যায়। করলেও এমন ইনসাফহীন অসিয়ত বতিলরূপে পরিগণিত হয়। কারণ, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীনের) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, ওর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ২৭৯৭, মুসলিম ১৭১৮-নং, প্রমুখ)*

যেহেতু বর্তমান যুগে দ্বীনে বিশেষ করে জানাযায় বহু ভেজাল অনুপ্রবেশ করে বহু বিদআত রচিত হয়ে সুন্নাহর আকার ধারণ করেছে, সেহেতু মরণাপন্ন ব্যক্তির এ অসিয়ত করাও উচিত এবং ওয়াজেব যে, তার কাফন-দাফন ইত্যাদি শেষক্রিয়া যেন সুন্নাহ্র পদ্ধতি অনুযায়ী হয় এবং এ বিষয়ে কোন প্রকারে বিদআতকে প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। এমনি অসিয়ত বহু সলফ তাঁদের ওয়ারেসীনদেরকে ক'রে গেছেন---যেমন ভূমিকায় কিছু উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআ'লার সেই বাণী ও নির্দেশের উপরেও আমল হয়, যাতে তিনি বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণের উপর; যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

অসিয়ত-নামা

বিসমিল্লাহির রাহমা-নির রাহীম,

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন, অস্‌স্বালা-তু অস্‌সালা-মু আলা রাসূলিহিল কারীম।

আমি------আল্লাহ তাঁর রসূল ও পরকালে বিশ্বাস রেখে সজ্ঞান ও সুস্থ মস্তিষ্কে আমার ওয়ারেসীনদেরকে সেই অসিয়ত করে যাচ্ছি; যা ইব্রাহীম ﷺ ও ইয়াকুব ﷺ তাঁদের পুত্রগণকে করেছিলেন, "হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীন (ইসলাম)কে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্ম-সমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করো না।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৩২ আয়াত)* আর যা রসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে করেছিলেন, "তোমরা নামাযে যত্নবান হও।"

অতঃপর তারা যেন সদা আল্লাহর ভয় রাখে, আপোসে সমিলে ও সদ্ভাবে বসবাস করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং সেই কাজ করে, যাতে আমার ও তাদের সকলের জন্য ইহ-পরকালে কল্যাণকর।

আমার মৃত্যুর পর আমার শোকে যেন কেউ মাতম করে কান্না না করে। জানাযার ব্যাপারে সকল বিদআত থেকে দূরে থাকে এবং সুন্নতী তরীকায় আমার শেষক্রিয়া সম্পাদন করে। আমি শরীয়তের পরিপন্থী প্রত্যেক কর্ম ও কথা থেকে সম্পর্কহীন। আমার সম্পত্তি বা টাকার এত পরিমাণ অমুক মসজিদ, মাদ্রাসা বা ব্যক্তিকে উইল করে যাচ্ছি। এই আমার অসিয়ত। "সুতরাং যে এ (অসিয়ত) শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করবে, তবে তার পাপ তাদের উপরেই বর্তাবে যারা তাতে পরিবর্তন করবে।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৮১ আয়াত)* আর আল্লাহর নিকট সকলের জন্য সৎকর্মের তওফীক এবং শুভমরণ কামনা করি। *অস্বাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ, অআলা আ-লিহি অস্বাহবিহী আজমাঈন।*

ইতি -

তারীখঃ -----------   (স্বাক্ষর) ---------

সাক্ষীঃ (১) --------   সাক্ষী (২) --------

প্রস্তুতিস্বরূপ রোগী তার নখ কেটে, বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করে রাখবে। মরণ আসন্ন বুঝে খুবাইব ﷺ এরূপ করেছিলেন। *(বুখারী ৩৯৮৯, আবুদাউদ ২৬৬০নং)*

রোগী তার মরণের সময় একান্ত নিকটবর্তী বুঝতে পারলে আল্লাহর রসূল ﷺ এর অনুকরণে নিম্নের দুআ করবে।

', &/ 0 " 1 2 ! ( ) *+ #$&

উচ্চারণ, আল্লা-হুম্মাগফিরলী অরহামনী অআলহিক্বনী বির্রাফীক্বীল আ'লা।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর এবং সুমহান বন্ধুর সাথে মিলিত কর। *(বুখারী ৪০৮৬ক, মুসলিম ৪৪৭৪ক, তিরমিযী ৩৪১৮ক, ইবনে মাজাহ ১৬০৮ক)*

"জীবন বলিছে মাটির মায়ায় আবার আসিব ফিরে,
বলিছে মরণ নিয়ে যাব তোরে মরণ-সাগর তীরে।"

জাকান্দানী

মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ ওষ্ঠাগত-প্রায় হওয়া বুঝলে সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের যা করা উচিত তা হল নিম্নরূপ ঃ-

১। কলেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া। পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের মরণাপন্ন ব্যক্তিকে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' স্মরণ করিয়ে দাও।" *(মুসলিম ১৫২৩ক, তিরমিযী ৮৯৮ক, নাসাঈ ১৮০৩ক, আবু দাউদ ২৭১০ক, প্রমুখ)*

"যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় সর্বশেষ কথা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' হবে সে একদিন জান্নাত প্রবেশ করবে - যদিও সে তার পূর্বে কিছু আযাব ভোগ করবে।" *(মাওয়ারিদুয যামআন ৭১৯নং, ইরওয়াউল গালীল ৬৭৯নং)*

"যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই' একথা জানা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম ৩৮-ক, আহমাদ ৪৩৪ক)*

অতএব এই শেষ মুহূর্তে যদি সে এই কলেমা উচ্চারণ করে ও হৃদয়ে এর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে মরণের হাতে আত্মসমর্পণ করতে পারে তাহলে সে শুরু থেকে না হলেও কোন এক সময়ে জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

তালকীনের অর্থ কেবল মরণাপন্ন ব্যক্তির সামনে কলেমা পাঠ করে শোনানোই নয় বরং ঐ কলেমা পাঠের আদেশও তাকে করা যায়। *(আহকামুল জানায়েয আলবানী ১০পৃঃ)*

হযরত আনাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আনসারদের এক

(মরণাপন্ন) ব্যক্তিকে দেখা করতে গিয়ে বললেন, "হে মামা! 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বল।" লোকটি বলল, 'মামা নাকি চাচা?' তিনি বললেন, "বরং মামা।" অতঃপর লোকটি বলল, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা কি আমার জন্য কল্যাণকর?' নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই।" *(আহমাদ ১২৮৫নং)*

অনুরূপ আদেশ করেছিলেন তাঁর চাচা আবু তালেবকেও; বলেছিলেন, "হে চাচা! আপনি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলুন---।" *(বুখারী ১৩৬০, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ ৫/৪৩৩)*

অবশ্য কলেমা বলার জন্য বারবার আদেশ করা উচিত নয়। কারণ সেই কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণার সময় বিরক্ত হয়ে তা বলতে অস্বীকার করতে পারে অথবা বিরক্ত হয়ে কোন অসমীচীন কথাও বলে ফেলতে পারে। সুতরাং কলেমার প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ পেলে মৃতের শেষ পরিণাম অশুভ হয়ে যাবে। অতএব নম্রতার সাথে ধীরে ধীরে তাকে কলেমা উচ্চারণ করাতে চেষ্টা করতে হবে। এর পরেও যদি সে না বলে, তাহলে তার ব্যাপার আল্লাহর হাতে। আল্লাহর নিকট আমরা শুভ পরিণাম প্রার্থনা করি। আমীন।

মরণাপন্ন ব্যক্তি কলেমা পাঠ করে নিলে তার নিকট উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গের উচিত, আর কিছু না বলে চুপ থাকা এবং তার সাথে অন্য কথা না বলা; যাতে তার সর্বশেষ কথা ঐ কলেমাই হয়। নচেৎ তারপর কথা বললে পুনরায় কলেমার তালকীন করা কর্তব্য। *(সাবউনা সুআলান ফী আহকামিল জানাইয, ইবনে উষাইমীন ৪ পৃঃ)*

এ স্থলে কতকগুলো বিষয় জেনে রাখা জরুরীঃ-

১। 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বলে অথবা আহলে বায়ত বা অন্য কোন বুযুর্গ ও অলীর নাম স্মরণ ও স্বীকার করানো বিদআত। *(আহকামুল জানাইয অবিদাউহা, বিদআত নং ৩)*

২। মুমূর্ষুর জন্য দুআ করা; আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ! ওর মরণকষ্ট আসান করে দাও ---' ইত্যাদি।

৩। কোন প্রকারের মন্দ কথা বা অন্যায় মন্তব্য না করা। কারণ, নবী ﷺ বলেন, যখন তোমরা কোন রোগী বা মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকবে, তখন ভালো কথাই বলো। কেন না, তোমরা যা বলবে তার উপর ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন-আমীন' বলবেন।" *(মুসলিম ১৫২৭ক, তিরমিযী ৮৯৯ক, প্রমুখ)* সুতরাং এ মুহূর্তে দুআ ও বদ্দুআ উভয়ই কবুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তাই এই সময় মূর্খ লোক ও বাজে মেয়েদের বাজে মন্তব্য এবং অহেতুক কলকলানি থেকে ঐ পরিবেশকে মুক্ত ও শান্ত রাখা উচিত। যাতে মুমূর্ষু ব্যক্তি কলেমা শুনতে, বুঝতে ও বলতে পারে এবং দুআময় পরিবেশে তার জীবনাবসান ঘটে। ওয়ারেসীনদের উচিত, এ কাজে মুমূর্ষুকে সর্বতোভাবে সহায়তা করা এবং মীরাস নিয়ে এই মুহূর্তে তার সামনে আপোসে বচসা না করা।

এই সময় মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন বা অন্যান্য সূরা পড়ার কথা শুদ্ধ হাদীসে নেই। সুতরাং এখন হতে সেই দাফন ও কবর যিয়ারত পর্যন্ত (নামাযে ছাড়া) কোন স্থানেই কুরআনের কোন আয়াত পড়া বিহিত নয়। অবশ্য মরণের সময় মরণোন্মুখ ব্যক্তি কুরআন তেলাঅত শুনতে চাইলে সে কথা ভিন্ন।

অন্যথা মৃতব্যক্তির শিয়রে কুরআন রাখা, পার্শ্বে বসে লোয়ানোর আগে পর্যন্ত অবিরাম কুরআন পড়া, (কোন দুর্গন্ধ না থাকলেও) ধূপধুনো দেওয়া, সারারাত্রি ব্যাপী বাতি জ্বালিয়ে রাখা, অপবিত্র (ঋতুমতী) কাউকে লাশের পাশ ঘেঁষতে না দেওয়া ইত্যাদি বিদআত। *(আহকামুল জানাইয ২৪৪ পৃঃ)*

তদনুরূপ মরণাপন্ন ব্যক্তিকে কেবলামুখ করা প্রসঙ্গে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। বরং সাঈদ বিন মুসাইয়িব এ কাজকে মকরূহ মনে করেছেন। যুরআহ বিন আব্দুর রহমান সাব্দুর রহমান সাঈদ বিন মুসাইয়িবের মৃত্যু রোগের সময় তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন আবু সালামাহ বিন আব্দুর রহমানও। এক সময় সাঈদ জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে আবু সালামাহ তাঁর বিছানাটাকে কেবলামুখ করতে আদেশ করলেন। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি বললেন, 'তোমরা আমার বিছানা ঘুরিয়ে দিয়েছ?!' সকলে বলল, 'হ্যাঁ।' একথা শুনে তিনি আবু সালামার প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার জ্ঞানে এ কাজ হয়েছে?' আবু সালামাহ বললেন, 'আমিই ওদেরকে আদেশ করলাম।' এরপর সাঈদ তাঁর বিছানাকে পূর্বাবস্থায় ঘুরিয়ে দিতে আদেশ করলেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ৪/৭৬)*

মুমূর্ষু ব্যক্তির মাধ্যমে কোন মৃতব্যক্তিকে সালাম পৌঁছানো বিদআত এ ব্যাপারে যে সলফের আমল বর্ণিত করা হয় তা সহীহ নয়। *(যয়ীফ ইবনে মাজাহ ৩১০নং, মিশকাত ১৬৩৩নং)*

ইসলাম পেশ করলে এই শেষ মুহূর্তে মুসলিম হয়ে যেতে পারে এই আশায় কোন কাফেরের মরণদশা দেখতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম পেশ করা উত্তম কাজ। হযরত আনাস ﷺ বলেন, একজন ইহুদী কিশোর নবী ﷺ-এর খিদমত করত। সে পীড়িত হলে মহানবী ﷺ তাকে দেখা করতে এলেন এবং তার শিথানে বসে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ কর (তুমি মুসলিম হয়ে যাও)।" তাঁর এই কথা শুনে সে তার পিতার দিকে (তার মত জানতে) দৃষ্টিপাত করল। তার পিতা তার নিকটেই বসে ছিল। সে বলল, 'আবুল কাসেম ﷺ-এর কথা তুমি মেনে নাও। ফলে কিশোরটি মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর নবী ﷺ এই বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন, "সেই আল্লাহর সকল প্রশংসা যিনি ওকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।" তারপর কিশোরটি মারা গেলে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা তোমাদের এক সাথীর উপর (জানাযার) নামায পড়।" *(বুখারী ১২৬৮-ক)*

এখানে লক্ষণীয় যে, কোন কাফের শেষ মুহূর্তে ঈমান আনলে তার জানাযা আদি পড়া হবে।

মৃত্যুর লক্ষণ

"জীবনের দীপ নিভে আসে যবে ঢেউ জাগে দেহ তীরে,
ওপারে দাঁড়ায়ে ডাকে 'মহাকাল' আয় মোর কোলে ফিরে।"

মরণোন্মুখ ব্যক্তি মালাকুল মাওত্ (মওতের ফিরিশ্তা) দেখতে পায়। লোক ভালো হলে তাঁকে সুশ্রী চেহারায় দেখে থাকে। আর তাঁর সাথে দেখে রহমতের আরো কয়েকজন শুভ্র চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশ্তাকে যাঁদের সঙ্গে থাকে জান্নাতের কাফন এবং সুগন্ধি। পক্ষান্তরে লোক মন্দ হলে মালাকুল মউতকে কুশ্রী চেহারায় দেখতে পায়। আর তাঁর সাথে কালো চেহারা বিশিষ্ট কয়েকজন আযাবের ফিরিশ্তাও দেখে থাকে; যাঁদের সাথে থাকে জাহান্নামের কাফন ও দুর্গন্ধ। এই সময় মুমূর্ষুর সমস্ত শক্তি চূর্ণ হয়ে যায়। বিকল হয়ে যায় সকল প্রকার প্রতিরোধ-ক্ষমতা। অনায়াসে নিজেকে সঁপে দিতে চায় মরণের হাতে। আর শুরু হয় তার বিভিন্ন প্রকার মৃত্যু যন্ত্রণা।

মৃত্যুর স্বাদ এত তিক্ত ও জ্বালাময়; যার উদাহরণ একাধিকঃ-

ক- উত্তপ্ত সিককাবাবের সিককে সিক্ত তুলোর মধ্যে ভরে পুনরায় টেনে নিলে তুলোর ভিতরে যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়, তাই হয় মরণ-পারের পথিকের ভিতরে।

খ- জীবন্ত একটি পাখি উত্তপ্ত তাওয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর যখন সে মারাও যায় না যাতে আরাম পেয়ে যায় এবং নিস্তারও পায় না যাতে সে উড়ে পালায়। ঠিক এমনি ভীষণ পরিস্থিতি হয় কণ্ঠাগত-প্রাণ মানুষের।

গ- একটি জীবন্ত ছাগের দেহ হতে একজন কসাই যখন তার ভোঁতা ছুরিকা দ্বারা চর্ম পৃথক করে, তখন ছাগের যে বিভীষিকাময় পরিণতি হয়, ঠিক তেমনি হবে মরণাপন্ন ব্যক্তির। তরবারির আঘাত, করাত দ্বারা ফাড়ার ব্যথা, কাঁইচি দ্বারা মাংস কাটার যন্ত্রণা অপেক্ষাও মৃত্যু যন্ত্রণা অনেক বেশী কঠিন ও মর্মান্তিক। *(আল-বিজাযাহ)*

মা আয়েশা (রাঃ) নবী ﷺ এর মৃত্যু সময়কালীন কষ্ট বর্ণনা করে বলেন, তাঁর হাতের কাছে একটি পানির পাত্র রাখা ছিল। তাতে হাত ডুবিয়ে তিনি বারবার মুখ মুছতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, "লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' অবশ্যই মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা।" অতঃপর তিনি তাঁর হাত উপর দিকে তুলে বললেন, "হে আল্লাহ! আমাকে পরম বন্ধুর সাথে (মিলিত কর।)" অতঃপর তাঁর রূহ কবয হলে তাঁর হাত লুটিয়ে পড়ল। *(বুখারী ৬৫১০নং)*

সুতরাং যদি এই অবস্থা সৃষ্টির সেরা মানুষ মহানবী ﷺ-এর হয়, তাহলে আরো অন্যান্যের যে কী হাল হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য।

যে সকল লক্ষণ দেখে জান কবজ হওয়া বুঝা যায় তা নিম্নরূপ ঃ-

১। দম গেলে মৃতের চক্ষু ঘূর্ণায়মান হয়ে পরে স্থির হয়ে যাবে। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ আবু সালামার নিকট এলেন; তখন তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার চক্ষু বন্ধ করে বললেন, "রূহ কবয হয়ে গেলে চক্ষু তার দিকে চেয়ে থাকে।" *(মুসলিম ১৫২৮, ইবনে মাজাহ ১৪৪৪ক)*

২- বাম অথবা ডান দিকে নাক বেঁকে যাবে।

৩-নিম্নের চিবুক ঢিলে হয়ে যাবে।

৪- হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে।

৫- সারা শরীর শীতল হয়ে যাবে।

৬- ঠ্যাং-এ ঠ্যাং জরিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "কখনও না যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে? আর সে মনে করবে যে, বিদায়ের সময় এসে গেছে। এবং ঠ্যাং ঠ্যাং-এর সাথে জড়িত হয়ে যাবে---।" *(সূরা ক্বিয়ামাহ ২৬-২৯ আয়াত)*

এই তো সেই শেষ নির্ধারিত সময় যার কোন প্রকার অন্যথা হবে না।

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

অর্থাৎ, আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সে সময় এসে উপস্থিত হবে তখন তারা মুহূর্তকাল ও বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারতে না। *(সূরা আ'রাফ ৩৪ আয়াত)*

"আমার গর্ব-গৌরব যত সব হল অবসান,
হে চির সত্য! তোমারেই আজি করি যে আত্মদান।
লৌহ কঠোর এই বাহু মোর তরবারি ক্ষুরধার,
বন্ধু আজিকে শক্তি যোগাতে কেহ নাই হেথা আর!"

মৃত্যুর পর করণীয়

রূহ কবয হয়ে গেলে উপস্থিত ব্যক্তিদের উচিতঃ-

১। তার চক্ষুদ্বয় খোলা থাকলে বন্ধ করে দেওয়া এবং তার জন্য পুনঃপুনঃ দুআ করা। যেমন, 'আল্লাহ ! তুমি ওকে ক্ষমা কর, সৎপথপ্রাপ্ত লোকেদের দলভুক্ত কর এবং ওকে মাফ করে দাও প্রভু! ওর মত (ভালো লোক) ওর বংশে পুনঃ দান কর। আমাদেরকে এবং ওকে মাফ করে দাও প্রভু! ওর কবরকে প্রশস্ত করো এবং তা আলোময় করে দিও---।" ইত্যাদি।

উম্মে সালামাহ ﷺ বলেন, নবী ﷺ আবু সালামার নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তার চক্ষু (মৃত্যুর পর) খোলা ছিল। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, "রূহ কবয হয়ে গেলে চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।" নবী ﷺ বললেন, "তোমরা নিজেদের উপর বদ্দুআ করো না। বরং মঙ্গলের দুআ কর।

কারণ, তোমরা যা বল তার উপর ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন-আমীন' (কবুল কর) বলে থাকেন।"

অতঃপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাহকে ক্ষমা করে দাও। ওর মর্যাদা উন্নীত করে ওকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের দলভুক্ত করে দাও। ওর অবশিষ্ট পরিজনের মধ্যে ওর পরবর্তী প্রদান কর। আমাদেরকে এবং ওকে মাফ করে দাও হে সারা জাহানের প্রভু! ওর জন্য ওর কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দাও।" *(মুসলিম ১৫২৮ক, ইবনে মাজাহ ১৪৪৪ক, আহমাদ ৬/২৯৭, বাইহাকী ৩/৩৩৪)*

২। মুখগহ্বর খোলা থাকলে বন্ধ করে দেবে। প্রয়োজনে দুই চিবুক চেপে কিছু বেঁধে দেবে। হাত-পা হিলিয়ে ঢিলা করে দেবে। অনিবার্য কারণে দাফনে দেরী হবে আশঙ্কা করলে লাশ ফ্রিজে রাখার ব্যবস্থা করবে।

৩। একটি চাদর বা কাঁথা দ্বারা তার সর্বশরীর ঢেকে দেবে। মা আয়েশা ﵂ বলেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁকে চেককাটা ইয়ামানী চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।" *(বুখারী ৫৩৬৭ক, আবু দাউদ ২৭১৩ক, প্রমুখ)*

তবে মৃতব্যক্তি হজ্জ করতে গিয়ে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মারা গেলে তার চেহারা ও মাথা ঢাকা চলবে না। কারণ, আব্বাস ﵁ বলেন, "আরাফাতে অবস্থান-কালে এক ব্যক্তি তার সওয়ারী থেকে পড়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেলে নবী ﷺ বললেন, "কুলের পাতা-মিশ্রিত পানি দ্বারা ওর গোসল দাও, (যে দুই ইহরামের কাপড় ও পরে আছে সে) দুই কাপড়েই ওকে কাফনিয়ে দাও, কোন খোশবু ওর দেহে লাগাবে না। আর ওর মাথা ও চেহারা ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন ও তালবিয়াহ পড়া অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।" *(বুখারী ১৭১৯ক, মুসলিম ২০৯২ক, প্রমুখ)*

৪। অতিসত্বর তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে এবং এতে মোটেই বিলম্ব করবে না। কারণ, নবী ﷺ বলেন, "তোমরা জানাযার কার্য শীঘ্র সমাধা কর-।" *(বুখারী ১২৩১ক, মুসলিম, ১৫৬৮ ক, প্রমুখ)*

৫। যে শহর বা গ্রামে মৃত্যু ঘটেছে সেই শহর বা গ্রামেই লাশ দাফন করবে। অন্য কোন স্থানে বহন করে সেখানে দাফন করা বিহিত নয়। কারণ, এ কাজ উক্ত শীঘ্রতার আদেশের পরিপন্থী। পরন্তু জাবের ﵁ বলেন, উহুদের যুদ্ধের

দিন মুসলিমদের লাশ বাকী'তে দাফন করার জন্য বহন করা শুরু হলে রসূলুল্লাহর তরফ থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ তোমাদেরকে তোমাদের লাশসমূহকে তাদের মৃত্যুস্থলে দাফন করতে আদেশ করেছেন।' আমার আম্মাজান তখন আমার আব্বাজান ও মামাজানকে একটি সেচক উটের পিঠে পাশাপাশি রেখে বাকীতে দাফন করার উদ্দেশ্যে বহন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাদেরকেও (ঐ আদেশানুসারে) ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।' *(আবু দাউদ ১৭৪২ ক, তিরমিযী ১৬৩৯ক, ইবনে মাজাহ ১৫০৫ক, আহমাদ ১৩৬৫৩ ক, মাওয়ারেদুয যামআন ১৯৬ নং, বাইহাকী ৪/৫৭)*

আয়েশা ﷺ এর এক ভাই ওয়াদিউল হাবাশাতে মারা গেলে এবং সেখান হতে তাঁর লাশ বহন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'যার শোক আমাকে সন্তপ্ত করেছে তা এই যে, আমার ইচ্ছা ছিল আমার ভাই-এর দাফন তার মৃত্যুস্থলেই হোক।' *(বাইহাকী, আহকামুল জানায়েয ১৪পৃঃ)*

কোন মর্যাদাপূর্ণ (বা তথাকথিত শরীফ) স্থানে দাফন করার অসিয়ত মৃতব্যক্তি করে থাকলেও তা মানা উচিত নয়। কারণ, এমন অসিয়ত বাতিল। *(আযকার, নওবী, আহকামুল জানায়েয ১৪ পৃঃ, টীকা)* আর সেখানে দাফন করলে মৃতের কোন ইষ্টলাভ হবে মনে করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

পক্ষান্তরে লাশের কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে; যেমন সেথায় দাফন করলে তার কবর বা লাশের উপর অত্যাচার হতে পারে, কোন বিবাদ, হঠকারিতা বা কুপ্রবৃত্তিবশে কেউ লাশের মর্যাদাহানি ঘটাতে পারে এমন ভয় হলে নিরাপদ স্থানে বহন করে দাফন করা ওয়াজেব।

তদনুরূপ কেউ বিদেশে মারা গেলে তার আত্মীয়-পরিজনের দর্শন আশা পূরণ করার জন্য এবং যিয়ারত সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে স্বদেশে বহন করে দাফন করাও প্রয়োজনে বৈধ। *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১০/৬২)*

৬। সত্বর তার বকেয়া ঋণ পরিশোধ করবে। এতে মৃত্যের ত্যক্ত সমস্ত সম্পদ লেগে গেলেও ঋণশোধে ওয়ারেসীনদের দ্বিধা করা উচিত নয়। ঋণ পরিশোধের মত অর্থ না থাকলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য তার তরফ থেকে সে ঋণ শোধ করা। তা না হলে বায়তুল মাল বা মুসলিমদের বিশেষ ফান্ড্ হতে ঋণ পরিশোধ করা হবে। অবশ্য এতে যদি কোন আত্মীয় বা অন্য কোন মুসলিম সাহায্য করে

ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাও উত্তম ও বৈধ।

সা'দ বিন আত্বঅল ﷺ বলেন, তার ভাই মাত্র ৩ শত দিরহাম রেখে মারা যান। আর ছেড়ে যান সন্তান-সন্ততিও। আমার ইচ্ছা ছিল ও দিরহামগুলো আমি তাঁর পরিবারবর্গের উপর খরচ করব। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে বললেন, "তোমার ভাই তো ঋণ-জালে আবদ্ধ। সুতরাং তুমি গিয়ে (আগে) তার ঋণ শোধ কর।" অতএব আমি গিয়ে তার ঋণ শোধ করে এলাম এবং নবী ﷺকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি তার সমস্ত ঋণ শোধ করে দিয়েছি। তবে একটি মহিলা দুই দীনার পাওয়ার কথা দাবী করছে, কিন্তু তার কোন সবুত নেই। তিনি বললেন, "ওকেও দিয়ে দাও। কারণ ও সঠিক বলছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৪ ক, আহমাদ ১৬৯৩ ক)*

রসূল ﷺ বলেছিলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয় অতঃপর তা পরিশোধে অপারগ হয়ে পরিশোধ না করেই মারা যায়, সে ব্যক্তির অভিভাবক আমিই।" *(আহমাদ ২৩৩১৬ ক, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৯৭৩নং, এ ব্যাপারে আরো অন্যান্য হাদীসও রয়েছে। দেখুন আহকামুল জানায়েয, আল্লামা আলবানী)*

মোট কথা, ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি জান্নাত প্রবেশে প্রতিবন্ধী থাকবে। অতএব কর্তব্য হল, মাইয়েতের ত্যক্ত সম্পত্তি ও অর্থ থেকে প্রথমে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা, অতঃপর তার ঋণ পরিশোধ, অতঃপর অসিয়ত পালন, এবং সবশেষে বাকী সম্পত্তি ও অর্থ ওয়ারেসীনদের মাঝে ভাগবন্টন করা হবে।

আত্মীয়-স্বজনের জন্য যা করা বৈধ

আত্মীয়-স্বজন বা উপস্থিত ব্যক্তিরা মাইয়্যেতের চেহারা খুলে দেখতে ও তাকে চুম্বন দিতে পারে। চাপা-কান্না কাঁদতে এবং তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করতে পারে। (অবশ্য স্ত্রী হলে মৃত স্বামীর জন্য ৪ মাস ১০দিন শোক পালন করবে।)

এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

সাহাবী জাবের ﷺ বলেন, 'যখন আমার পিতা (আব্দুল্লাহ) ইন্তিকাল করলেন, তখন আমি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। এ দেখে সকলে আমাকে নিষেধ করল। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেন নি। অতঃপর নবী ﷺ-এর আদেশক্রমে তাঁর জানাযা উঠানো হল। এতে আমার ফুফু ফাতেমা কাঁদতে শুরু করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "কাঁদ অথবা না কাঁদ, ওর লাশ উঠানো পর্যন্ত ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের পক্ষ দ্বারা ওকে ছায়া করে রেখেছিল।" *(বুখারী ১১৬৭ ক, মুসলিম ৪৫১৭ ক, প্রমুখ)*

মা আয়েশা ﷺ বলেন, 'আবু বকর ﷺ তাঁর বাসা সুন্হ থেকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এলেন। ঘোড়া থেকে নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর নবী ﷺ এর নিকট গেলেন। তিনি তখন চেককাটা ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিলেন। আব্বা (আবু বকর) তাঁর চেহারার কাপড় খুলে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাঁর দুই চক্ষের মাঝে চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, 'আমার মা ও বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আপনার মধ্যে দুটি মরণ একত্রিত করবেন না। এখন যে মরণ আপনার উপর অবধার্য ছিল তা আপনি বরণ করে নিয়েছেন।'

অন্য এক বর্ণনাতে তিনি বললেন, 'আপনি সেই মৃত্যু বরণ করে নিয়েছেন যার পর আর কোন মৃত্যু নেই।' *(বুখারী ১২৪২নং, নাসাঈ ১৮১৮ক, প্রমুখ)*

মা আয়েশা ﷺ বলেন, 'উষমান বিন মাযঊন মারা গেলে নবী ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি তাঁর চেহারার কাপড় খুলে ঝুঁকে তাঁকে চুম্বন করলেন। অতঃপর তিনি এমন কাঁদলেন যাতে দেখলাম, তাঁর চোখের পানি তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।' *(তিরমিযী ৯১০ক, আবু দাউদ ২৭৫০ ক, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৪৫৬নং)*

এ ছাড়া জা'ফর মারা গেলে মহানবী ﷺ তার পরিজনের নিকট ৩ দিন না এসে শোক প্রকাশে ঢিল দিলেন। অতঃপর তাদের নিকট এসে বললেন,

"আজকের পর থেকে তোমরা আমার ভায়ের জন্য কাঁদবে না।" *(আবু দাউদ ৩৬৬০ক, নাসাঈ ৫১৩২ক, আহমাদ ১৬৫৯ ক)*

নবী করীম ﷺ-এর শিশুপুত্র ইবরাহীম মারা গেলে তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রু বইতে লাগল। আব্দুর রহমান বিন আউফ বললেন, 'আপনিও কাঁদছেন হে আল্লাহর রসূল?! তিনি বললেন, "এটি হল মমতার ফল, চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করে, অন্তর সন্তপ্ত হয়, আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট তা ছাড়া আমরা অন্য কথা বলি না। আর তোমার যাওয়াতে আমরা বড় দুঃখিত, হে ইব্রাহীম!" *(বুখারী, মুসলিম বাইহাকী ৪/৬৯ প্রমুখ)*

"চলহে পথিক আপনার জনে ভাসায়ে নয়ন নীরে,
খেলা শেষ হল ধীরে চল ঐ মরণ সাগর তীরে।"

আত্মীয়-স্বজনের জন্য যা করা ওয়াজেব

মৃত্যুর সময় কথা জানতে পারলে তার পরিবার বর্গের উপর এই বিপদের সময় দুটি কর্ম ওয়াজেব হয়ঃ-

১- আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর ও বিধানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ধৈর্যধারণ করা। যেহেতু আল্লাহ এতে বান্দাকে পরীক্ষা করেন এবং যা কিছু হয় তা সবই মুমিনের জন্য মঙ্গলদায়ক। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে এবং ধন-প্রাণ ও ফল-ফসলে নোকসান দিয়ে পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদের শুভসংবাদ দাও; যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ

(আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।) এই সকল লোকেদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আশিস ও করুণা বর্ষিত হয়, আর এরাই হল সৎপথপ্রাপ্ত। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৭ আয়াত)*

আনাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে পার হলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর, আর ধৈর্য ধর।" মহিলাটি (যেন রেগে উঠে) বলল, 'সরে যাও আমার কাছ থেকে আমার যা মুসীবত তা তোমার কাছে আসেনি!' আসলে মহিলাটি তাঁকে চিনতে পারেনি। পরে কেউ তাকে বলল যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ! একথা শুনে তার যেন মরণদশা উপস্থিত হল। মহিলাটি আল্লাহর রসূল ﷺ এর দরজায় এল। দেখল, দরজায় কোন দারোয়ান নেই। তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, " বিপদের প্রথম চোটেই ধৈর্য ধরা হল আসল ধৈর্য।" *(বুখারী ৬৬২১ক, মুসলিম ১৫৩৪ক, প্রমুখ)*

বিশেষ করে কোন শিশু-সন্তান মারা গেলে তার উপর ধৈর্যধারণ করার প্রতিদান ও মাহাত্ম্য বেশী। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

নবী ﷺ বলেন, "যে মুসলিমের তিনটি শিশু-সন্তান মারা যাবে সে আল্লাহর কসম বহাল রাখার মত সামান্য ক্ষণ ছাড়া জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা।" যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, 98 (6+BC &+ অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেককেই তার (দোযখের) উপর দিয়ে যেতে হবে। এ তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। *(সূরা মারয়াম ৭১ আয়াত, বুখারী ১২৫১নং, ফাতহুল বারী ৩/১৪৮, মুসলিম, প্রমুখ)*

"যে মহিলার ৩'টি শিশু-সন্তান মারা যাবে সে মহিলার জন্য ঐ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দা-স্বরূপ হবে।" একজন মহিলা বলল, 'আর দু'জন হলে?' তিনি বললেন, "দু'জন হলেও।" *(বুখারী ১২৪৯নং, মুসলিম,প্রমুখ)*

২। এই বিপদের সময় (মৃত্যু জানতে পেরে বা খবর শুনে এবং তার পরেও) পরিজনের জন্য বলা ওয়াজেব ঃ- * D(" '+ 3+ 3+ ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেউন। (যেমন পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।) আর এরপরই

নিম্নের দুআ বলাও বিধেয় ঃ-

’ %3 4 & ! 567 $ 89 #$&

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আ-জিরনী ফী মুসীবাতী অআখলিফলী খায়রাম মিনহা।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে তুমি আমাকে প্রতিদান দাও এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর।

এই দুআ পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা বিগত ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা উত্তম বিনিময় প্রদান করে থাকেন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, কোনও মুসলিমের উপর যখন কোন বিপদ আসে এবং সে যদি আল্লাহর আদেশমত ‘ইন্না লিল্লা-হি-----খাইরাম মিনহা’ বলে তাহলে আল্লাহ তার ঐ বিপদ অপেক্ষা উত্তম বিনিময় দান করেন।” উম্মে সালামাহ বলেন, অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবু সালামাহ মারা গেলেন তখন আমি বললাম, ‘মুসলিমদের মধ্যে আর কে এমন ব্যক্তি আছে যে (আমার নিকট) আবু সালামার চেয়ে ভালো হবে? যার পরিবার ছিল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি প্রথম হিজরতকারী পরিবার।’ আমি (মনে মনে) এরূপ বারবার বলতাম। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ-কে বিনিময় স্বরূপ আমাকে দান করলেন। তিনি হাত্বেব বিন আবী বালতাআহকে আমার নিকট বিবাহের পয়গাম দিয়ে পাঠালেন। আমি বললাম, ‘আমার একটি মেয়ে আছে, আর আমি বড় (সপত্নীর বিষয়ে) ঈর্ষাবতী।’ কিন্তু তিনি বললেন, ‘আমরা তার মেয়ের জন্য দুআ করব, যাতে আল্লাহ তার নিকট থেকে মায়ের প্রয়োজন দূর করে দেন এবং আরো দুআ করব, যাতে তার (উম্মে সালামার) ঈর্ষা দূরীভূত হয়ে যায়।” *(মুসলিম ১৫২৫ ক, আহমাদ ১৫৭৫১ ক, বাই হাকী ৪/৬৫)*

বলা বাহুল্য, উম্মে সালামাহ উক্ত দুআর ফযীলতে উত্তম স্বামীরূপে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে লাভ করেন।

মা-বাপ, ভাই বা ছেলের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে মহিলারা অলঙ্কার ও প্রসাধন বর্জন করতে পারে। আর এমন কাজ ধৈর্য ধারণের পরিপন্থী নয়। তবে এমনটি কেবল তিন দিন বৈধ; তার অধিক নয়। অবশ্য স্বামী মারা গেলে তার জন্য ৪ মাস ১০ দিন (এবং গর্ভ হলে প্রসবকাল পর্যন্ত) অলঙ্কার, সৌন্দর্য,

সুগন্ধি ও প্রসাধনাদি বর্জন করে শোক পালন করা বিধেয়। *(বুখারী)*

যয়নাব বিন্তে আবী সালামাহ বলেন, আমি নবী ﷺ এর এক পত্নী উম্মে হাবীবার নিকট গেলে তিনি বললেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসিনী কোন কোন মহিলার জন্য কোন মৃতের উপর তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে মৃত স্বামী হলে তার উপর ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।" *(বুখারী ১২০১ক, মুসলিম ২৭৩০ ক, প্রমুখ)*

পক্ষান্তরে কোন নারী যদি তার স্বামীকে মিলন দিয়ে খুশী ও সন্তুষ্ট করার জন্য কারো মৃত্যুতে শোক প্রকাশ না করে তবে এটা তার জন্য অতি উত্তম। কারণ এরূপ করার পশ্চাতে প্রভূত কল্যাণের আশা করা যায়। যেমন, ঘটেছিল উম্মে সুলাইম রুমাইসা (বিবি রমিসা) ও তাঁর স্বামী আবু তালহা ؓ-এর সাংসারিক জীবনে।

তাঁদের একমাত্র সন্তান ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। আবু তালহা এক সময় নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন। এদিকে বাড়িতে তাঁর ছেলে মারা গেল। উম্মে সুলাইম সকলকে নিষেধ করলেন, যাতে আবু তালহার নিকট খবর না যায়। তিনি ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে ঢেকে রেখে দিলেন। অতঃপর স্বামী আবু তালহা রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে বাড়ি ফিরলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার বেটা কেমন আছে?' রুমাইসা বললেন, 'যখন থেকে ও পীড়িত তখন থেকে যে কষ্ট পাচ্ছিল তার চেয়ে এখন খুব শান্ত। আর আশা করি সে আরাম লাভ করেছে!'

অতঃপর পতিপ্রাণা স্ত্রী স্বামী এবং তাঁর সাথে আগত আরো অন্যান্য মেহমানদের জন্য রাত্রের খাবার পেশ করলেন। সকলে খেয়ে উঠে গেল। আবু তালহা উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। (স্ত্রীর কথায় ভাবলেন, ছেলে আরাম পেয়ে ঘুমাচ্ছে।) ওদিকে পতিব্রতা রুমাইসা সব কাজ সেরে উত্তমরূপে সাজ-সজ্জা করলেন, সুগন্ধি মাখলেন। অতঃপর স্বামীর বিছানায় এলেন। স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে সৌন্দর্য, সৌরভ এবং নির্জনতা পেলে উভয়ের মধ্যে যা ঘটে তা তাঁদের মাঝে (মিলন) ঘটল। তারপর রাত্রির শেষ দিকে রুমাইসা স্বামীকে বললেন, 'হে আবু তালহা! যদি কেউ কাউকে কোন জিনিস ধার স্বরূপ ব্যবহার করতে দেয়, অতঃপর সেই জিনিসের মালিক যদি তা ফেরৎ নেয় তবে ব্যবহারকারীর কি বাধা দেওয়া বা কিছু বলার থাকতে পারে?' আবু তালহা

বললেন, 'অবশ্যই না।' স্ত্রী বললেন, 'তাহলে শুনুন, আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল আপনাকে যে ছেলে ধার দিয়েছিলেন তা ফেরৎ নিয়েছেন। অতএব আপনি ধৈর্য ধরে নেকীর আশা করুন!'

এ কথায় স্বামী রেগে উঠলেন; বললেন, 'এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলে চুপ থেকে, এত কিছু হওয়ার পর তুমি আমাকে আমার ছেলে মরার খবর দিচ্ছ?!' অতঃপর তিনি 'ইন্না লিল্লাহি----' পড়লেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট ঘটনা খুলে বললে তিনি তাঁকে বললেন, "তোমাদের উভয়ের ঐ গত রাত্রে আল্লাহ বর্কত দান করুন।" সুতরাং ঐ রাত্রের রুমাইসা তাঁর গর্ভে আবার একটি সন্তান ধারণ করে। *(ত্বায়ালিসী ২০৫৬, বাইহাকী ৪/৬৫-৬৬, ইবনে হিব্বান ৭২৫, আহমাদ ৩/১০৫-১০৬ প্রভৃতি। দেখুন আহকামুল জানায়েয ২৪-২৬ পৃঃ)*

আত্মীয়র জন্য যা করা হারাম

১। মাতম করা, উচ্চরোলে কান্না করা, গাল নোচা, কাপড় ছেঁড়া, চুল ছেঁড়া, বুকে থাপড় মারা, ইনিয়ে-বিনিয়ে রোদন করা, মাইয়্যেতের অতিরিক্ত প্রশংসা করা, 'ও আমার সাত কোদালের মুনিস! ও আমার সাত রাজার ধন' ইত্যাদি বলে হা-হুতাশ সহ আর্তনাদ করে, তকদীরকে গালি দিয়ে, আল্লাহর প্রতি অবিচারের প্রতি অভিযোগ আরোপ করে কান্না করা, মাটি মাখা, মাথায় মারা, কপাল ঠোকা ইত্যাদি হারাম। এমনটি করাই হল ধৈর্যশীলতার পরিপন্থী এবং ভাগ্যের উপর অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ। এটা একটি প্রাক্ ইসলামের জাহেলী কুপ্রথা। যেমন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে চারটি কর্ম রয়েছে যা জাহেলিয়াতের বিষয়ীভূত; যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ-মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, (অন্যের) বংশে খোঁটা দেওয়া, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং মাতম করে কান্না করা।"

তিনি আরো বলেন, "মাতমকারিণী নারী যদি তার মরণের আগে তওবা না করে মারা যায়, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন দাহ্য আলকাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়াময় জামা পরিয়ে দাঁড় করানো হবে।" *(মুসলিম ১৫৫০ক, বাইহাকী ৪/৬৩)*

তিনি বলেন, "দুটি কর্ম মানুষের মাঝে রয়েছে যা কাফেরদের কাজ; কারো বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃতর জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম ১০০ক, বাইহাকী ৪/৬৩)*

মরার পর আত্মীয়-স্বজনরা বিশেষ করে মহিলারা মাতম করে, তা জানা সত্ত্বেও যদি কেউ তা না করতে অসিয়ত না করে মারা যায় অথবা মরার পূর্বে তার জন্য মাতম করার অসিয়ত করে যায়, তাহলে সেই মৃতব্যক্তিকেও তার পরিবারের মাতমের দায়ে কবরে ও কিয়ামতে আযাব ভোগ করতে হবে। *(দেখুন, বুখারী ১২০ ক, মুসলিম ১৫৪ ক, আহকামুল জানাইয ২ পৃঃ টীকা)*

অবশ্য শব্দহীনভাবে গুপ্ত কান্নায় নয়নাশ্রু বিগলিত হওয়া দূষণীয় নয়। যেমন, পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

২। শোকে ভেঙ্গে পড়ে মাথা নেড়া করে ফেলা হারাম। কারণ, মহানবী ﷺ এমন মহিলা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন, যে তার কেউ মারা গেলে) উচ্চস্বরে কান্না করে, নিজের মাথা নেড়া করে ফেলে এবং কাপড় ছিঁড়ে।" *(বুখারী ১২৯৬নং, মুসলিম ১৪৯ক)*

৩। মহিলাদের আলুলায়িত কেশদাম ছড়িয়ে রাখা (মাথা না বাঁধা) বৈধ নয়। কারণ, জনৈক বায়আতকারিণী সাহাবী বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যে সব সৎ বিষয়ে আমাদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে এও যে, আমরা তাঁর অবাধ্যাচরণ করব না, (বিপদের সময়) চেহারা নুচব না, ধ্বংস ডাকব না, বুকের কাপড় ছিঁড়ব না এবং চুল ছিটিয়ে রাখব না। *(আবু দাউদ ২৭২৪ক, বাইহাকী ৪/৬৪)*

৪। শোকে বিমর্ষ হয়ে কেবল কয়েকদিনকার জন্য দাড়ি বাড়ানো; যদিও এর পূর্বে সে সর্বদা চেঁছে বা ছোট করে ছেঁটেই ফেলত। অতঃপর শোক দূর হলে পুনরায় চাঁছতে বা ছাঁটতে শুরু করা বৈধ নয়। কারণ, কয়েক দিনকার জন্য দাড়ি ছাড়া বাহ্যতঃ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত চুল ছড়ানোর শামিল। অতএব তা নিষিদ্ধ, অবৈধ এবং বিদ্‌আতও। তবে হ্যাঁ এরপর থেকে যদি তওবা করে দাড়ি ছেড়ে রেখে আর না চাঁছে বা না ছাঁটে, তবে সেটাই হল ওয়াজেব। *(আহকামুল জানাইয)*

৫। শোক পালনের জন্য বিশেষভাবে কালো কাপড় পরা অথবা অন্য কোন বিশেষ ধরন বা রঙের লেবাস পরা বিদআত। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন)*

৬। মৃত্যু সংবাদ সাধারণভাবে রেডিও, টিভি,পত্র-পত্রিকা ও লাউডস্পিকার প্রভৃতি শব্দবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে অথবা উচ্চরবে বাজারে বাজারে, পাড়ায়

পাড়ায় অথবা মসজিদের মিনারে-মিনারে অথবা দরজায়-দরজায় ঘোষণা ও প্রচার করা নিষিদ্ধ ও অবৈধ। হুযাইফা বিন য়্যামান ﷺ এর কোন আত্মীয় মারা গেলে বলতেন, 'মৃত্যুর খবর কাউকে জানাব না। কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে, তা মৃত্যু সংবাদ প্রচারের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করায় নিষেধ করতে শুনেছি।' *(তিরমিযী ৯০৭ক, ইবনে মাজাহ ১৫৬৫ক, আহমাদ ২২৩৫৮ক)*

আল্লামা আলবানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, (E) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, মৃতব্যক্তির মৃত্যুর খবর দেওয়া। সুতরাং এই অর্থে সকল ধরনের খবর দেওয়াই এর শামিল। কিছু সহীহ হাদীস এসেছে যা এক ধরনের খবর দেওয়ার বৈধতার কথা প্রমাণ করে। উলামাগণ বলেন, এ ধরনের খবর দেওয়ার ব্যাপারটা মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপার থেকে ব্যতিক্রম। মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করার অর্থ হল এমন এলান ও ঘোষণা করা যেমন জাহেলী যুগে বাড়ির দরজায় দরজায় ও বাজারে বাজারে চিৎকার করে প্রচার করা হত।

পক্ষান্তরে এমনভাবে মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া বৈধ, যাতে জাহেলী যুগের ঐ মৃত্যু-সংবাদ প্রচার ও ঘোষণা করার অর্থ পাওয়া যায় না। বরং অনেক সময় মৃত্যু সংবাদ অপরকে জানানো ওয়াজেব হয়। যেমন, যদি মৃতব্যক্তির নিকট এমন লোক না থাকে যাতে গোসল-কাফন ও জানাযার নামায ইত্যাদি যথা নিয়মে পালন হতে পারে।

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, "বাদশা নাজাশী যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন নবী ﷺ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ সকলকে জানান এবং মুসাল্লায় বের হয়ে গিয়ে কাতার বানিয়ে চার তকবীর দিয়ে (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়েন।" *(বুখারী ১১৬৮ক, মুসলিম ১৫৮০ক)*

মৃত্যুব্যক্তির ঝুটা অতিরঞ্জিত প্রশংসা করে সংবাদ দেওয়া সংবাদদাতার জন্য বৈধ নয়। আর তার জন্য মুস্তাহাব হল যাকে মৃত্যু সংবাদ জানাবে তার নিকটে মৃতব্যক্তির জন্য দুআর আবেদন করা। আবু কাতাদাহ হতে বর্ণিত, -- (মূতা যুদ্ধের যোদ্ধাদের খবর বর্ণনা করে নবী ﷺ বললেন,) "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের যোদ্ধাদলের সংবাদ দেব না? তারা বহু পথ চলার পর শত্রুদলের সম্মুখীন হয়েছে। অতঃপর যায়দ শহীদ হয়ে গেছে, অতএব

তোমরা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।” এতে সকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। তিনি পুনঃ বললেন, “এরপর পতাকা ধারণ করেছে জা’ফর বিন আবী তালেব। সে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিনভাবে লড়ে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছে। আমি তার শাহাদতের সাক্ষী। সুতরাং তোমরা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর পতাকা ধারণ করেছে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা। দৃঢ়পদে লড়াই লড়ে শেষে সেও শহীদ হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা তার জন্যও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।----” *(আহমাদ ৫/২৯৬, ৩০০-৩০১, ২১৫০৯ক)*

মৃতের দম যাওয়া মাত্র বাড়ির লোকের কিছু সদকাহ করা বিদআত। যেমন, মৃত্যুর খবর শুনে কোন প্রতিষ্ঠানের লোকেদের সমবেত হয়ে মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হয়ে ক্ষণেক নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা অনৈসলামিক প্রথা। এরূপ মুসলিমরা করতে পারে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/৩৭-৩৮)*

যে স্থানে দম যায় সেই স্থানে কয়েকদিন ধরে রূহ ঘোরাফিরা বা যাতায়াত করে এমন ধারণা ভ্রান্ত ও বিদআত। তাই সে স্থানে কয়েকদিন যাবৎ লাতা দেওয়া, বাতি জ্বালানো, ধূপধুনো দেওয়া এবং পরে মসজিদের ইমাম ও জামাআত সহ মীলাদ অনুষ্ঠান করে সেই রূহ তাড়ানোর ব্যবস্থা করা বিদআত।

জান কবজ হওয়ার সময় বাড়িতে যে পানি বা পাকানো খাবার ছিল তা ফেলে দেওয়া, ঝাড়বাতি আয়না প্রভৃতি আবৃত করাও বিদআত। *(আহকামুল জানায়েয, বিদআত নং ২১)*

বেনামাযী বা নামায ত্যাগকারীর নামায ছাড়ার গোনাহ মাফ করাবার উদ্দেশ্যে ওয়াক্ত হিসাব করে নির্দিষ্ট কাফ্ফারা দেওয়ার ফলে মুর্দার কোন লাভ হয় বলে শরীয়তে কিছু নেই। সুতরাং এমন নামায খন্ডনের কাফ্ফারা প্রথা বিদআত। আর বেনামাযী তওবা না করে মারা গেলে আর কোন কাফ্ফারাই তার কাজে লাগবে না। *(দেখুন, ইসলাহুল মাসাজিদ, মিনাল বিদায়ি অল আওয়ায়িদ, আহকামুল জানাইয ১৭৪, ২৫৭পৃঃ, মু’জামুল বিদা ১৬৪পৃঃ)*

শুভ মরণের লক্ষণ

মুসলিম মারা গেলে তার পরপারের জীবন কেমন হবে তার কিছু লক্ষণ মরণমুহূর্তে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর মধ্যকালে ও পরকালে তার জীবন সুখের হবে এমন শুভমরণের কিছু লক্ষণ নিম্নরূপ ঃ-

১। মরণের সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমার শুদ্ধ উচ্চারণ, কলেমাটি বিশুদ্ধচিত্তে (অর্থ জেনে) শুদ্ধভাবে পাঠ করে ইন্তেকাল করলে ইনশাআল্লাহ মাইয়্যেত জান্নাতবাসী হবে। অবশ্য অন্যান্য পাপের শাস্তি তাকে পূর্বেই ভুগতে হবে।

পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(হাকেম, মাওয়ারিদুয যামআন ৭১৯নং)*

২। মরণের সময় ললাটে ঘর্মবিন্দু ঝরা। মহানবী ﷺ বলেন, "মুমিনের মৃত্যুকালে তার কপালে ঘাম ঝরে।" *(তিরমিযী ৯৮২নং, নাসাঈ ১৮২৭নং, ইবনে মাজাহ ১৪৫২নং, আহমাদ ৫/৩৫০, ৩৫৭, ৩৬০, হাকেম ১/৩৬১, ইবনে হিব্বান ৭৩০ প্রমুখ)*

৩। জুমআর রাত্রে অথবা দিনে ইন্তেকাল হওয়া। মহানবী ﷺ বলেন, "যে মুসলিম জুমআর দিন মারা যায় আল্লাহ তাকে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচান।" *(সহীহ তিরমিযী ৮৫৮-নং, আহমাদ ৬২৯৪ক)*

৪। জিহাদের ময়দানে খুন হওয়া। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ ۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে জীবিত ও তারা জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত। আর তাদের পিছনের যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আপোসে আনন্দ প্রকাশ করে এই নিয়ে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে তা

আপোসে আনন্দ প্রকাশ করে। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের শ্রম-ফল নষ্ট করেন না। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৬৯-১৭১ আয়াত)*

জানের নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে ৬টি দান; তার রক্তের প্রথম ক্ষরণের সাথে তার পাপ ক্ষমা করা হবে, জান্নাতে তার বাসস্থান দেখানো হবে, কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে, কিয়ামতের মহাত্রাস থেকে নিরাপত্তা পাবে, ঈমানের অলঙ্কার পরিধান করবে, সুনয়না হুরীদের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে এবং তার নিজ পরিজনের মধ্যে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে।" *(তিরমিযী ১৫৮৬ক, ইবনে মাজাহ ২৭৮৯ক, আহমাদ ১৬৫৫৩ক, সহীহ তিরমিযী ১৩৫৮-নং)*

৫। আল্লাহর পথে জিহাদে থেকে গাজী হয়ে ইন্তেকাল করা। প্লেগ, পেটের রোগে বা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া। যেহেতু এমন মাইয়্যেতরা শহীদের মর্যাদা পায়। প্রাণের নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কাকে কাকে তোমরা শহীদ বলে গণ্য কর?" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) নিহত হয় সেই ব্যক্তি শহীদ।' তিনি বললেন, "তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদ-সংখ্যা নেহাতই কম।" সকলে বলল, 'তবে তারা আর কারা, হে আল্লাহর রসূল?' বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে (গাজী হয়ে) মারা যায় সে শহীদ, যে প্লেগরোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ।" *(মুসলিম ৩৫৩৯ক, আহমাদ ৯৩১৮-ক)*

যে ব্যক্তি দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায় সেও শহীদের দর্জা পায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "শহীদ হল পাঁচ ব্যক্তি; প্লেগরোগে মৃত, পেটের রোগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত শহীদ, দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত শহীদ এবং আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত ব্যক্তি শহীদ।" *(বুখারী ৬১৫, মুসলিম ৩৫৩৮-ক)*

তদনুরূপ আগুনে পুড়ে মরা, প্লুরিসি রোগে মরা, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মহিলার প্রাণত্যাগ করাও শহীদী মরণ। নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হওয়া ছাড়া আরো সাত ব্যক্তি শহীদ হয়; প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ডুবে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, প্লুরিসি রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পুড়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মৃত

ব্যক্তি শহীদ এবং সে মহিলাও শহীদ যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়।” *(মালেক, মুঅত্তা ৪৯৩ক, আবু দাউদ ২৭০৪ক, সহীহ আবু দাউদ ২৬৬৮নং)*

ক্ষয় রোগে মরাও শুভ মরণের শুভ লক্ষণ; এমন মৃত্যুও শহীদের মর্যাদা দান করে। রসূল আমীন ﷺ বলেন, “-----ক্ষয় রোগের ফলে মরণ শহীদের মরণ।” *(মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩১৭, ৫/ ৩০১)*

ধন-সম্পদ ডাকাতের খপ্পরে পড়লে, পরিবার পরিজন, নিজের দ্বীন বা জান বিনাশের শিকার হলে তা রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুও শহীদী মৃত্যু। নবী করীম ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ, যে নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ, যে নিজের দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ এবং যে তার নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সেও শহীদ।” *(আবু দাউদ ৪১৪২ক, নাসাঈ ৪০২৬ক, তিরমিযী ১৩৪১ক)*

তদনুরূপ নিজের সওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে যে মারা যায়, সেও শহীদ। *(সহীহুল জামে' ৬৩৩৬নং)*

শত্রুঘাটি বা সীমান্ত প্রতিরক্ষার কাজে থাকা অবস্থায় মরণ ও শুভ মরণ। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “একটি দিন ও রাতের প্রতিরক্ষা কাজ একমাস (নফল) রোযা ও নামায অপেক্ষা উত্তম। মরার পরেও তার সেই আমল জারী থাকে যা সে জীবিত অবস্থায় করত। তার রুজী জারী হয় এবং (কবরের) যাবতীয় ফিতনা থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে।” *(মুসলিম ২৫৩৭ক, তিরমিযী ১৫৮৮ক, নাসাঈ ৩১১৬ক)*

কোন নেক আমল ও সৎকার্য করা অবস্থায় মরণও শুভ মরণ। পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে এবং সেটাই তার শেষ কথা হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে একদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখে এবং সেটাই তার শেষ আমল হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কিছু সাদকাহ করে এবং সেটা তার শেষ কর্ম হয় তবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।” *(আহমাদ ২২২৩৫ক)* বলা বাহুল্য, 'সব ভালো তার, শেষ ভালো যার।'

উল্লেখ্য যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'শহীদ' বলা বা উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ, নির্দিষ্টভাবে 'শহীদ' কে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। অবশ্য মহানবী ﷺ যাদেরকে 'শহীদ' বলে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের

কথা স্বতন্ত্র। *(আশ্‌শারহুল মুমতে' ৫/৩৭৮)*

প্রতিবেশীর একাধিক দ্বীনদার, জ্ঞানী সৎলোক যদি মৃত ব্যক্তির জন্য দ্বীনদারী ও সততার সাক্ষ্য দেয়, তবে সে ব্যক্তিও ঐ সাক্ষ্যানুসারে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে জান্নাতী হবে।

আবুল আসওয়াদ দুয়ালী বলেন, এক সময় আমি মদীনায় এলাম। তখন সেখানে চলছিল মহামারী; ব্যাপক আকারে মানুষ মারা যাচ্ছিল। আমি গিয়ে উমার বিন খাত্তাব ﷺ এর নিকট বসলাম। এমন সময় একটি জানাযা পাশ দিয়ে পার হল। তার প্রশংসা করা হলে তিনি বললেন, 'ওয়াজেব হয়ে গেল।' আমি বললাম 'কি ওয়াজেব হয়ে গেল, হে আমীরুল মু'মিনীন?' তিনি বললেন, 'যা আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন; তিনি বলেছেন, "যে মুসলিমের জন্য চার ব্যক্তি নেক হওয়ার সাক্ষ্য দেবে তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" আমরা বললাম, 'আর তিনজন হলে?' তিনি বললেন, "তিনজন হলেও।" অতঃপর একজন সাক্ষ্য দিলে সে মর্যাদা আছে কিনা তা আর জিজ্ঞাসা করলাম না।' *(বুখারী ১২৭৯ক, তিরমিযী ৯৭৯ক, নাসাঈ ১৯০৮ক, আহমাদ ১৩৩ক)*

অবশ্য মৃতব্যক্তির পরিজনবর্গের কারো লাভজনক মনে করে কোন প্রতিবেশীকে সাক্ষী মানা ও তা গ্রহণ করা বিদআত। তবে সকলের উচিত, মৃত মানুষের দুর্নাম ও মন্দ চর্চা না করা। *(বুখারী, আবু দাঊদ, নাসাঈ, বাইহাকী)*

পূর্ণিমার দিনে বা রাতে, সূর্যগ্রহণের দিনে অথবা চন্দ্রগ্রহণের রাতে ইন্তেকাল কোন শুভলক্ষণ বা মহৎ ব্যক্তিত্বের চিহ্ন নয়। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "---চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর বহু নিদর্শনের দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু অথবা জন্মের জন্য তাদের গ্রহণ লাগে না। গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দা সকলকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন।" *(বুখারী ৯৮৬ক, মুসলিম ১৪৯৯ক)*

তদনুরূপ অমাবশ্যার রাতে মরণ কোন অশুভ লক্ষণ নয়- যেমন, বহু লোকে ধারণা করে থাকে এবং মৃতব্যক্তির প্রতি কুধারণা রাখে।

অনুরূপভাবে আকস্মিক মৃত্যু এবং জাকান্দানীর সময় কষ্ট না পাওয়াও শুভমরণের লক্ষণ নয়। তবে দম যাওয়ার পর চেহারা হর্ষোৎফুল্ল ও উজ্জ্বল হওয়া এবং শাহাদতের আঙ্গুল (তর্জনী) উপর দিকে উঠে যাওয়া শুভ মরণের লক্ষণ।

অশুভ মরণের লক্ষণ

কিছু লক্ষণ এমন আছে যাতে বুঝা যায় যে, মওতার মওত শুভ নয়। যেমন শির্ক, কুফরী, কাবীরা গোনাহ ও বিভিন্ন অসৎকর্ম করা অবস্থায় মরণ অশুভ মরণের লক্ষণ। এ ছাড়া জান কবজের পর ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে যাওয়া, চেহারা কৃষ্ণবর্ণ বা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, মালাকুল মাওতের নিকট থেকে আল্লাহর ক্রোধের কথা শুনে মাইয়্যেতের চেহারায় অসন্তুষ্টি ও ঘাবড়ে যাওয়ার স্পষ্ট ছাপ পড়ে যাওয়া, চেহারার সাথে সারা দেহ কালো হয়ে যাওয়া প্রভৃতি অশুভ মরণের লক্ষণ ধরা যায়। আর সকলের ঠিকানা আল্লাহই অধিক জানেন। *(দেখুন, আলবিজাযাহ ৫০ পৃঃ)*

মাইয়্যেতের গোসল

অহেতুক বিলম্ব না করে কিছু লোকের মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরী। এ গোসল দেওয়া ওয়াজেব (কিফায়াহ)। নবী করীম ﷺ-এর একাধিক আদেশ এই ওয়াজেব হওয়ার কথা প্রমাণ করে। যেমন, এক ইহরাম বাঁধা হাজীকে তার সওয়ারী আছাড়ে দিলে সে মারা যায়। নবী ﷺ সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, "ওকে কুলপাতা-মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও--।" *(বুখারী ১১৮৬ক, মুসলিম ২০৯২ক, প্রমুখ)*

তাঁর কন্যা যয়নাবকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, "ওকে তিনবার গোসল দাও অথবা পাঁচ, সাত বা তারও অধিকবার---।" *(বুখারী ১১৭৫ক, মুসলিম, ১৫৫৭ক, প্রমুখ)*

যে ব্যক্তি গোসল দেওয়ার দায়িত্ব নেয় তার জন্য রয়েছে বিরাট পরিমাণের সওয়াব। তবে এই সওয়াব লাভের শর্ত হল দুটি; প্রথমতঃ সে যেন এ কাজ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে এবং কোন প্রকারের পার্থিব প্রতিদান, স্বার্থ বা কৃতজ্ঞতা লাভের আশায় না করে। দ্বিতীয়তঃ, সে যেন মৃতের সকল ত্রুটি গোপন করে এবং অপ্রীতিকর কিছু দেখলে তা কারো কাছে প্রকাশ না করে।

পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে গোসল দেয় এবং তার

সকল ত্রুটি গোপন করে আল্লাহ তাকে ৪০ বার ক্ষমা করে দেন।” আর এক বর্ণনায় আছে, “৪০টি কাবীরাহ গোনাহ মাফ করে দেন।” *(হাকেম ১/৩৫৪, ৩৬২, বাইহাকী ৩/৩৯৫, মাযমাউয যাওয়াইদ ৩/২১)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে গোসল দেয় এবং তার ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ সে ব্যক্তির গোনাহ গোপন (মাফ) করে দেন। আর যে ব্যক্তি মুর্দাকে কাফনায় আল্লাহ তাকে (বেহেশ্তী) ফাইন রেশমের বস্ত্র পরিধান করাবেন।” *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহুল জামে' ৬৪০৩নং)*

গোসল দেওয়ার অধিক হকদার সেই ব্যক্তি যাকে মাইয়্যেত জীবিতাবস্থায় অসিয়ত করে যাবে। তা না হলে তার সবচেয়ে অধিক নিকটাত্মীয় গোসল দেবে। অবশ্য যে ব্যক্তি গোসলের সুন্নাহ আদির অধিক জ্ঞান রাখে এবং যার মধ্যে আমানতদারী; কথায়, কাজে নামাযে ও দ্বীনদারীতে বেশী আমানতদারী আছে। তাকেই এ কাজের জন্য প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

অবশ্য স্ত্রীর জন্য স্বামীকে গোসল দেওয়া এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীকে গোসল দেওয়া অধিক শোভনীয় ও সমীচীন। যেহেতু দাম্পত্য জীবন থেকেই উভয়েই এক অপরের দেহের গোপনীয়তা রক্ষায় যত্নশীল। তাই এই বিদায় মুহূর্তেও সেই গোপনীয়তার সাথেই শেষ খিদমত পাওয়ার উভয়েই উপযুক্ত।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘যা হয়ে গেছে তা যদি আবার ফিরে আসত তাহলে নবী ﷺ-কে তাঁর স্ত্রীগণ ছাড়া অন্য কেউ গোসল দিত না।’ *(ইবনে মাজাহ ১৪৫৩ক, আবু দাউদ ২৭৩২ক, সহীহ ইবনে মাজাহ ১১৯৬নং)*

মা আয়েশা ؓ আরো বলেন, ‘একদা নবী ﷺ কারো জানাযা পড়ে বাকী’ (গোরস্থান) থেকে আমার নিকট এলেন। তখন আমার মাথায় ছিল যন্ত্রণা। আমি বলছিলাম, ‘হায় আমার মাথা গেল!’ তিনি বললেন, “বরং আমার মাথাও গেল! (হে আয়েশা!) তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও এবং আমি তোমাকে গোসল দিই, কাফনাই, অতঃপর তোমার উপর জানাযা পড়ে তোমাকে দাফন করি, তাহলে এতে তোমার নোকসান আছে কি?” *(ইবনে মাজাহ ১৪৫৪ক, আহমাদ ২৪৭২০ক, দারেমী ৮০ক, সহীহ ইবনে মাজাহ ১১৯৭নং, দারাকুত্বনী ১৯২নং, বাইহাকী ৩/৩৯৬)*

আর এখানে একথা বলা যথার্থ নয় যে, এ ব্যাপারটা নবী ﷺ-এর জন্য খাস। কারণ, যে কোনও বিধানের কার্যকারিতা হল সাধারণ ও ব্যাপক। অবশ্য খাস ও

নির্দিষ্ট হওয়ার দলীল থাকলে সে কথা ভিন্ন। পরন্তু খাস হওয়ার কোন দলীল নেই।

এ ছাড়া আবু বকর ﷺ তাঁর স্ত্রী আসমাকে মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে গোসল দেওয়ার জন্য অসিয়ত করেছিলেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ১০৯৬৯, ১০৯৭০নং)*

ফাতেমা (রাঃ) অসিয়ত করেছিলেন, যেন তাঁকে তাঁর স্বামী আলী ﷺ এবং আসমা বিনতে উমাইস ﷺ গোসল দেন। ফলে তাঁরাই তাঁর গোসল দিয়েছিলেন। *(দারাকুত্বনী ১৮৩৩নং, বাইহাকী ৩/৩৯৬)* এ ছাড়া আরো দলীল দেখুন, ইবনে আবী শাইবাতে *(২/৪৫-৪৫৬)*।

মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জান্নাতী হলে উভয়েই জান্নাতে একই সাথে বাস করবে। আর সম্পর্ক ছিন্ন হয় না বলেই তো এক অপরের ওয়ারেস হয়ে থাকে। পরন্তু সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ দলীলও নেই।

মৃতের স্ত্রী অথবা মৃতার স্বামী না থাকলে পুরুষের গোসল পুরুষ এবং মহিলার গোসল মহিলাই দিতে পারে। পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলার ক্ষেত্রে মহিলা না পাওয়া গেলে অথবা (দগ্ধ ইত্যাদি) লাশের জন্য গোসল ক্ষতিকর হলে অথবা পানি না পাওয়া গেলে মাইয়্যেতকে তায়াম্মুম করানো হবে। হাতে কোন আবরণ রেখে তায়াম্মুমের নিয়মানুসারে মাটি দ্বারা লাশের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় (কব্জি পর্যন্ত) মাসাহ করে দিতে হবে। *(দেখুন, ইবনে আবী শাইবাহ ১০৯৬২-১০৯৬৫নং, আশ্-শারহুল মুমতে' ৫/৩৭৫)*

সাত বছরের নিম্নে কোন বালক-বালিকার লাশের যে কোন পুরুষ অথবা মহিলা গোসল দিতে পারে। কারণ, তাদের লজ্জাস্থান ঢাকা ওয়াজেব নয়। *(আলবিজাযাহ ৭৫পৃঃ)*

ঋতুমতী মহিলাও - তার ঋতু অবস্থায় থাকলেও - মৃতা বা শিশুকে গোসল দিতে পারে। *(মুগনী)*

আলকামাহ, আত্বা প্রভৃতি ইমামগণ বলেন, ঋতু বা বীর্যপাত-জনিত নাপাকে থেকেও মৃতকে গোসল দেওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। *(ইবনে আবী শাইবাহ ১০৯৫৮, ১০৯৬০নং)*

গোসল দেওয়ার পদ্ধতি

❖ গোসল দেওয়ার জন্য স্থানটি পাঁচ দিকে ঘেরা হবে। (উপর দিকেও ছাদ অথবা পর্দা হতে হবে।)

❖ গোসল দাতা সহায়তার জন্য ২/১ জন ভালো লোক সঙ্গে নিতে পারে। বাকী ঐ পর্দা-সীমার ভিতরে যেন কেউ না থাকে ও গোসল না দেখে। অবশ্য গোনাহ অধিক করে এমন লোককেও সঙ্গে রাখা চলে। যাতে সে মুর্দার হাল দেখে উপদেশ গ্রহণ এবং তওবা করতে পারে। আর উপদেশের জন্য মৃত্যু যথেষ্ট।

❖ গোসলদাতা মুখে মুখাচ্ছাদন লাগাতে পারে অথবা কাপড় নাকে-মুখে বেঁধে নিতে পারে; যদি কোন রকম দুর্গন্ধ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে।

❖ 'এপ্রন' বা সজ্জারক্ষণী কাপর দেহের সম্মুখ ভাগে বেঁধে নিতে পারে যাতে কোন নাপাকী তার শরীর বা পোশাকে না লেগে যায়। উভয় হাতে রবারের দস্তানা বা হ্যান্ডকভার পরা উত্তম। যাতে হাতে ময়লা না লাগে এবং লাশের লজ্জাস্থান আদিতে সরাসরি স্পর্শ না হয়।

❖ উভয় পায়ে 'গাম-সু' ব্যবহার করতে পারে একই উদ্দেশ্যে।

❖ গোসলদাতা মাইয়েতের দেহ অনুযায়ী পরিমাণমত পানি প্রস্তুত রাখবে। ১ বালতি সাদা সাধারণ পানি, ১ বালতি কুলের পাতা মিশ্রিত পানি এবং অপর আর ১ বালতি কর্পুর মিশ্রিত পানি প্রস্তুত রাখবে। কুলপাতা পিষে পানিতে দিয়ে এমনভাবে ঘাঁটবে যাতে পানিতে ফেনা দেখা যায়। প্রতি লিটার পানিতে দুই টুকরা কর্পুর দিতে হবে। এর সঙ্গে প্রয়োজনে সাবান ও শ্যাম্পু ব্যবহারও উত্তম।

❖ লাশ তুলে একটি তক্তা বা পাটার উপর ধীরে রাখবে। এ তক্তা বা পাটার যেদিকে লাশের মাথা রাখা হবে সেদিকটা যেন একটু উঁচু হয়, যাতে মাথার দিকের পানি পায়ের দিকে গড়িয়ে নেমে যায়। এই পাটা কেবলামুখ হওয়া জরুরী নয়। উল্লেখ্য যে, লাশ তোলা-নামা করার সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র

যিক্র বিদআত।

❖ এরপর লাশের লজ্জাস্থানের উপর মাত্র একটি মোটা কাপড় রেখে দেহের পরিহিত সমস্ত কাপড় খুলে দেবে। নবী ﷺ-এর যুগে এরূপই আমল ছিল। *(আবু দাউদ, হাকেম ৩/৫৯-৬০, বাইহাকী ৩/৩৮৭, আহমাদ ৬/২৬৭)*

উল্লেখ্য যে, নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত লজ্জাস্থান দেখা সকলের জন্য হারাম। মহিলা গোসলদাত্রীও মহিলার ঐ স্থান দেখবে না।

❖ বরফে জমা লাশ হলে অথবা কোন কাপড় খুলতে অসুবিধা হলে কাপড় কেটে বের করে নেব।

❖ নখ, গোঁফ ইত্যাদি কেটে ফেলার ব্যাপারে কোন নির্দেশ বর্ণিত হয়নি। অনেকে এসব কাটা বিদআত বলেছেন। *(আহকামুল জানায়েয ১৪পৃঃ, মুজামুল বিদা ১২৯পৃঃ)*

❖ নাক ও মুখগহ্বরে ময়লা থাকলে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে পরিষ্কার করবে। শ্লেষ্মা আদি নিরবচ্ছিন্নভাবে বের হতেই থাকলে তুলা ইত্যাদি দ্বারা ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেবে।

❖ মাইয়্যেতের দেহের কোন অংশে জমাট বাঁধা ময়লা থাকলে এবং কুলের পাতা দ্বারা দূর না হলে তা সাবান অথবা অন্য কোন পরিষ্কারক বস্তু দিয়ে পরিষ্কার করে দেবে।

❖ বাম হাতে (কভারের উপরেই) একটি ন্যাকড়া জড়িয়ে নেবে। অতঃপর সহায়ক সাথীদের সাহায্যে লাশের মাথার দিক একটু তুলে অর্ধ বসার ন্যায় বসাবে এবং ধীরে ধীরে ২/৩ বার পেটের উপর চাপ দেবে, যাতে বাহির-মুখী কোন নাপাকী থেকে থাকলে বের হয়ে যাবে। ময়লা ন্যাকড়া হাত হতে খুলে দেবে। তারপর গোসলদাতা কভার বা ন্যাকড়া-জড়ানো বাম হাত পর্দার নিচে থেকে শরমগাহে ফিরিয়ে এবং উপর থেকে এক'জন পানি টেলে পরিষ্কার করে দেবে। তারপর কভার অথবা ময়লা ন্যাকড়াটি হাত থেকে খুলে ফেলবে।

❖ যদি নাপাকী একটানা অথবা বারবার বের হতে থাকে, তাহলে ২/৩ বার ধুয়ে দেখার পর ছিদ্রপথ তুলা বা বস্ত্রখন্ড দ্বারা বন্ধ করে দেবে। প্রয়োজন হলে এর উপর প্লাস্টার-পটি ব্যবহার করতে পারে। প্রকাশ যে, এ ছাড়া পৃথকভাবে 'বার গোসল' বলে আর কিছু নেই। মাটির ঢেলা ব্যবহার করার কথাও হাদীসে

বর্ণিত হয় নি। সুতরাং ন্যাকড়া ব্যবহার করাই উচিত।

অতঃপর গোসলদাতা গোসল দেবার নিয়ত করে মাইয়্যেতের উভয় হাত 'বিসমিল্লাহ' বলে কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে দেবে। (ভিজে পরিষ্কার ন্যাকড়ার সাহায্যে) তিনবার মুখের ভিতর দাঁত সহ মাসাহ করবে। তিনবার নাকের ভিতর মাসাহ করে দেবে। অতঃপর সাধারণ ওযুর ন্যায় মুখমন্ডল, হাত ইত্যাদি যথা নিয়মে ধুইয়ে মাথা ও কান মাসাহ করে পা ধুইয়ে ওযু সমাধা করবে।

অতঃপর কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা মাইয়্যেতের মাথা ও মুখমন্ডল (দাড়ি সহ) উত্তমরূপে ধৌত করবে। মহিলার মাথায় চুটি গাঁথা থাকলে খুলে নিয়ে ভালোরূপে এবং প্রয়োজন হলে শ্যাম্পু দ্বারা ধৌত করবে।

অতঃপর মাইয়্যেতকে বামপার্শ্বে শয়ন করিয়ে ঐ পানি দ্বারা কাঁধ থেকে শুরু করে ডান পায়ের শেষাংশ পর্যন্ত ভালোভাবে রগড়ে দেবে। তারপর ডান কাতে শুইয়ে বাম পার্শ্ব অনুরূপ ধৌত করবে। পর্দার নিচে লজ্জাস্থানসমুহে কভার দেওয়া হাত ফিরিয়ে ধুয়ে দেবে।

পুনঃ দ্বিতীয়বার ঐ একই পানি দ্বারা একই রূপে গোসল দেবে। অতঃপর কর্পূর মিশ্রিত পানি দ্বারা মাথা ও মুখমন্ডল ধুয়ে দেওয়ার পর অনুরূপ একবার গোসল দেবে।

এরপরেও নাপাকী দেখা দিলে তিনের অধিক ৫ ও ৭ বা ততোধিকবার বিজোর গোসল দেওয়া যায়। তবে শেষ বারে যেন কর্পূর মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল হয়। *(বুখারী ১১৭৫ ক, মুসলিম ১৫৫৭ক, প্রমুখ)*

এরপর শুষ্ক কাপড় দ্বারা মাইয়্যেতের দেহ মাথা, বুক, মুখ, পেট, হাত, পা, মুছে দেবে। লজ্জাস্থানের উপর ভিজে কাপড়টিকে অন্য একটি শুষ্ক কাপড় দ্বারা পাল্টে দেবে। মাইয়্যেতের চুল আঁচড়ে দেবে। *(বুখারী ১১৭৬, মুসলিম ১৫৫৮ক, ইবনে আবী শাইবাহ ১০৯৯১নং)* মহিলার চুল আঁচড়ে চুটি গেঁথে কাফনানোর সময় লাশের পিছন দিকে ফেলে রাখবে। মাথার দুই সাইডে দুটি এবং সামনের দিকে চুল নিয়ে একটি মোট তিনটি বেণী হবে। *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ,নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ ৫/৮৪-৮৫, ৬/৪০৭-৪০৮)*

এ পর্যন্ত করলে লাশ কাফনানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

লাশের কোন অঙ্গ অগ্নিদগ্ধ বা কোন দুর্ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাকলে

কাপড় জড়িয়ে গোসলের পর ঐ অঙ্গে মাসাহ করে দেবে।

চারমাসের নিম্নের গর্ভপাতজনিত ভ্রূণের গোসল, কাফন ও নামায নেই। একটি ছোট কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করা হবে। চার মাসের ঊর্ধ্বের ভ্রূণের কাফন-দাফন সাত বছরের নিম্নের বালক-বালিকার মতই। সুতরাং ঐ ভ্রূণের নাম রাখতে হবে এবং আকীকাও দিতে হবে। *(আহকামুল জানাইয ৮১পৃঃ, আল-বিজাযাহ ৭৫পৃঃ, আশ্-শারহুল মুমতে' ৫/৩৭৪, ৭/৫৩৯)*

সর্বদা মাইয়্যেতের সম্মানের খেয়াল রাখবে গোসলদাতা, যাতে গোসল দেওয়ার সময় বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রতি ধস্তাধস্তি না হয় ও গোসলে শীতের সময় শীতল এবং গ্রীষ্মের সময় খুব গরম পানি ব্যবহার না করা হয়।

লাশের মুখে বাঁধানো সোনার দাঁত থাকলে যদি মুখ এঁটে বন্ধ থাকে, তাহলে বল প্রয়োগ করে খোলার চেষ্টা করবে না। খোলা থাকলে এবং দাঁত সহজে বের করা সম্ভব হলে বের করে নেবে, নচেৎ বলপূর্বক বের করবে না। *(আল-বিজাযাহ ৭৫পৃঃ)*

হজ্জ করতে গিয়ে ইহরাম অবস্থায় মৃত মুহরিমের গোসলে কোন প্রকার সুগন্ধি বা কর্পূর ব্যবহার বৈধ নয়। যেহেতু পূর্বোক্ত ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মৃত হাজীর জন্য নবী ﷺ বলেছিলেন, "ওকে কুলপাতা-মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও, ওর দুই কাপড়ে কাফনাও এবং সুগন্ধি লাগায়োনা---।"

জিহাদের ময়দানে হত শহীদের গোসল নেই; যদিও বা সে অপবিত্র অবস্থায় প্রাণ হারায়। তাঁকে তাঁর পোশাক ও খুন সহ দাফন করা হবে। নবী ﷺ উহুদের দিন এই নির্দেশই দিয়েছিলেন। *(বুখারী ১২৬০ক, তিরমিযী ৯৫৭ক, নাসাঈ ১৯২৯ক, প্রমুখ)*

আনাস ﷺ বলেন, উহুদ যুদ্ধের শহীদদের গোসল দেওয়া হয়নি; তাঁদেরকে তাঁদের খুন সহ দাফন করা হয়েছিল। *(আবু দাউদ ২৭২৮ক, তিরমিযী ৯৩৭ক, সহীহ আবু দাউদ ২৬৮৮নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, হামযা বিন আবু মুত্তালিব ও হানযালা বিন রাহেব নাপাক অবস্থায় (উহুদ যুদ্ধে) শহীদ হন। নবী ﷺ বলেন, "আমি দেখেছি যে, ফিরিশ্তাগণ উভয়কে গোসল দিচ্ছে।" *(তাবরানীর কাবীর, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/২৩, হাকেম ৩/১৯৫)* সুতরাং নাপাকে থাকা অবস্থায় নিহত শহীদকে গোসল দেওয়া ওয়াজেব হলে ফিরিশ্তাদের গোসল দেওয়ায় ওয়াজেব পালন হত না। বরং নবী ﷺ তাঁদেরকে গোসল দিতে সাহাবীগণকে আদেশ করতেন। কারণ, মৃতকে গোসল দেওয়ার পশ্চাতে উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের এক ইবাদত পালন।

(আহকামুল জানাইয ৫৬পৃঃ টীকা)

গোসলদাতার জন্য (বিশেষ করে তার নিজ দেহে কোন নাপাকী লাগার সন্দেহ থাকলে) গোসল করা মুস্তাহাব। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মৃতের গোসল দেয় সে যেন গোসল করে এবং যে তা বহন করে সে যেন ওযু করে।" *(আবু দাউদ ২৭৪৯ক, তিরমিযী ৯১৪ক, ইবনে মাজাহ ১৪৫৩ক, সহীহ আবু দাউদ ২৭০৭নং)*

তাঁর এই আদেশের নির্দেশ হল মুস্তাহাব। কারণ, তিনি আরো বলেন, "তোমরা যখন তোমাদের মুর্দাকে গোসল দাও তখন তোমাদের জন্য গোসল জরুরী নয়। কেননা, তোমাদের মুর্দা তো নাপাক নয়। সুতরাং কেবল হাত ধুয়ে নেওয়াই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।" *(হাকেম ১/৩৮৬, বাইহাকী ৩/৩৯৮)*

মাইয়্যেতের গোসল দেওয়ার সময় গোসলদাতা যদি তার কোন ত্রুটি বা অপ্রীতিকর কিছু দেখে থাকে - যেমন চেহারা কালি ও বিকৃত হয়ে যাওয়া, তার দেহ হতে দুর্গন্ধ বের হওয়া ইত্যাদি - তাহলে তা প্রচার করা বা কাউকে বলা বৈধ নয়। ভালো কিছু দেখলে; যেমন হাসি মুখ, দেহে ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি দেখলে বা সুগন্ধ পেলে তা প্রচার করতে পারে। *(আল-মুমতে' ৫/৩৭৬)*

গোসল দেওয়ার সময় কোন বাংলা মেয়েলী ছড়া বলা, প্রত্যেক অঙ্গে পানি ঢালার সময় নির্দিষ্ট দুআ বা কলেমার যিক্র করা, গোসল দেওয়ার স্থানে কয়েকদিন ধরে বাতি জ্বালানো বা ধূপ ইত্যাদি দেওয়া বিদআত।

গোসল দেওয়ার সময় ব্যবহৃত ন্যাকড়া আদি ফেলবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। (মাটির) বাড়ির মধ্যেই যে কোন জায়গায় বা যেখানে সুবিধা সেখানেই পুঁতে দেওয়া অথবা মিউনিসিপ্যালিটির ডিব্বায় ফেলে দেওয়া যায়। এ কাপড় বা ময়লা এমন কিছু নয় যে, এতে ভূত (?) জড়িয়ে থাকে- যেমন, অনেকের ধারণা। তাই তো এগুলো ঝুলতলায় (?) ফেলা হয় এবং ঝুলতলাকে সম্মান অথবা ভয় করা হয়। আর ঐ ময়লা ফেলতে যাওয়ার সময় সঙ্গে লোহাও রাখা হয়। যা বিদআত ও শির্ক।

অনুরূপ একটি অলীক ধারণা এই যে, অনেকে মনে করে লোয়ানোর পানি ডিঙ্গাতে নেই এবং ডিঙ্গালে কোন অমঙ্গল হয়। তাই তো ঐ পানির জন্য (নিকাশ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও) বিশেষ গর্ত খোঁড়া হয়।

অনেকের ধারণা, মওতার পদতলে দাঁড়াতে নেই। অথচ এসব নিছক মেয়েলী ব্যাপার।

কাফন

গোসল দেওয়ার পর মাইয়্যেতকে কাফনানো ওয়াজেব। এ ব্যাপারে পূর্বের ইহরাম বাঁধা হাজীর হাদীসে মহানবী ﷺ-এর আদেশ এসেছে, "আর ওকে (দুই কাপড়ে) কাফনা ও ----।"

যে ব্যক্তি মাইয়্যেত কাফনায় তার জন্য রয়েছে বিরাট সওয়াব।

পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "আর যে ব্যক্তি তাকে কাফন পরায়, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সূক্ষ্ম ও স্থুল রেশমবস্ত্র পরিধান করাবেন।"

কাফন হবে মাইয়্যেতের নিজের ক্রয় করা, ব্যবহৃত অথবা তার নিজস্ব অর্থ দ্বারা (অন্য কারো মারফৎ) কেনা কাপড়। খাব্বাব বিন আরাত্ত্ ؓ বলেন, 'আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর পথে রসূল ﷺ-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। যার দরুন আমরা আল্লাহর নিকট সওয়াবের অধিকারী ছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক, যারা তাদের কোন প্রকার (পার্থিব) প্রতিদান (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ভোগ করেনি। এদের মধ্যে একজন বলেন, মুসআব বিন উমাইর যিনি উহুদ যুদ্ধে নিহত হলেন। একটি চেক-কাটা চাদর ছাড়া তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি কিছুও ছিল না। সেই চাদর দিয়ে তাঁকে কাফনাবার সময় যখন আমরা তাঁর মাথা ঢাকছিলাম, তখন তাঁর পা বের হয়ে যাচ্ছিল। আর তা দিয়ে যখন তাঁর পা ঢাকছিলাম, তখন মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থা থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "ঐ চাদর দ্বারা ওর মাথার দিকটা ঢেকে দাও, এবং ওর পা দুটির উপর ইযখির ঘাস বিছিয়ে দাও।" আর আমাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তির ফল পরিপক্ক, ফলে তারা তা চয়ন করছে। *(বুখারী ৩৭৭৩ ক, মুসলিম ১৫৬২ক,প্রমুখ)*

মৃতের ব্যয়যোগ্য সে অর্থ না থাকলে ওয়ারেসীনরা এই ব্যয়ভার বহন করবে। তারাও অপারগ হলে মুসলিমদের 'বায়তুল মাল' বা বিশেষ ফান্ড্ থেকে এর জন্য অর্থ ব্যয় করা হবে।

কাফনের কাপড় পরিষ্কার, মোটাজাতীয় সূতী, মাঝামাঝি মূল্যের সর্বাঙ্গ আবরক হওয়া মুস্তাহাব ও বাঞ্ছনীয়। কারণ, জাবের ؓ হতে বর্ণিত, একদা

নবী ﷺ ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি তাঁর এক সাহাবীর কথা উল্লেখ করলেন; যাকে খাটো কাপড় দ্বারা কাফনানো হয়েছিল এবং রাতেই দাফন করে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর নিরুপায় অবস্থা ছাড়া (বেশী সংখ্যক লোকের) জানাযার নামায না পড়া পর্যন্ত রাতে কোন মুর্দা দাফন করার ব্যাপারে নবী ﷺ ভর্ৎসনা করলেন। আর তিনি বললেন, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইকে কাফন পরায় তখন তার উচিত, সাধ্যমত উত্তম কাফন সংগ্রহ করা।” *(মুসলিম ১৫৬৭ক, আবু দাউদ ২৭৩৭ক, আহমাদ ১৩৬৩১ক)*

উলামাগণ বলেন, ‘উত্তম কাফনের’ অর্থ হল, তা যেন পরিষ্কার হয়, মোটা ও সর্বাঙ্গ-আবরক চওড়া হয় এবং তা যেন মাঝারি মূল্যের হয়। এখানে ‘সাধ্যমত উত্তম’ বলতে মূল্যবান কাপড় সংগ্রহে অর্থের অপচয় বা অতিরঞ্জন করা উদ্দিষ্ট নয়। *(আহকামুল জানাইয ৫৮ পৃঃ)*

কাফনের কাপড় সংখ্যা মাত্র একটি হওয়াই ওয়াজেব; যদি তাতে মৃতের সারা দেহ ঢেকে যায় তবে। অবশ্য সারা দেহের জন্য যথেষ্ট না হলে লাশের মাথার দিকটায় কাফন পরিয়ে পায়ের দিকটা ইযখির বা অন্য কোন ঘাস (বা খড়) দ্বারা আবৃত করতে হবে। যেমন এ ব্যাপারে নির্দেশ খাব্বাব বিন আরাত্তের হাদীসে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

তদনুরূপ কাফন কম হলে এবং মাইয়্যেতের সংখ্যা বেশী হলে একই কাফনে ২/৩টি লাশ কাফনানো বৈধ। এ ক্ষেত্রে কেবলার দিকে সেই মুর্দাকে রাখতে হবে যার কুরআন মুখস্থ (এবং জ্ঞান ও আমল) অধিক ছিল। এ ব্যাপারে হযরত আনাস ﷺ বলেন, “উহুদের যুদ্ধে নিহতের সংখা কাফনের তুলনায় বেশী ছিল। ২/৩ জনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। কুরআন কে বেশী জানে তা জিজ্ঞাসা করে এমন লোককে লহদ (কবরে) আগে রাখা হয়েছিল। আর একই কাপড়ে ২/৩ জন নিহতকে কাফনানো হয়েছিল। *(আবু দাঊদ ২৭২৯ক, তিরমিযী ৯৩৭ক, প্রমুখ)*

জিহাদের ময়দানে নিহত শহীদের পরিহিত লেবাস খুলে নেওয়া বৈধ নয়। বরং সেই লেবাস সহ তাঁর কাফন ও দাফন করতে হবে। কেননা, পিয়ারা নবী ﷺ উহুদ যুদ্ধে নিহত শহীদদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন, “ওদের লেবাস সহ ওদেরকে কাফনাও।” *(আহমাদ ২২৫৪৭,২২৫৫০ক, নাসাঈ ১৯৭৫, ৩০৬৭ক, সহীহ নাসাঈ ১৮৯২নং)*

হজ্জ-উমরার ইহরামে মুহরিম মৃত ব্যক্তিকে তার সেই ইহরামের দুই কাপড় দিয়েই কাফনাতে হবে। যেহেতু নবী ﷺ পূর্বোক্ত সওয়ারী-পিষ্ট মৃত মুহরিমের জন্য বলেছিলেন, "--ওকে ওর ঐ দুই কাপড় দ্বারাই কাফনাও; যে কাপড়ে ও ইহরাম বেঁধেছিল।" *(বুখারী ১৭১৯ক, মুসলিম ২০৯২ক, ত্বাবারানীর কাবীর)*

অবশ্য সাধারণ মাইয়্যেতের জন্য কাফনের কাপড় গণনায় তিনটি হওয়া মুস্তাহাব ও বাঞ্ছনীয়। যেহেতু মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ রসূল ﷺ-কে ইয়ামানের সহুল শহরে প্রস্তুত সাদা রঙের তিনটি সুতির কাপড় দ্বারা কাফনানো হয়েছিল। তাতে কোন কামীস বা পাগড়ী ছিল না। সাধারণভাবে তাঁকে তার মধ্যে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।' *(বুখারী ১১৮৫ক, মুসলিম ১৫৬৪ক, প্রমুখ)*

সুতরাং কাফনের কাপড় সাদা হওয়াই উত্তম। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের লেবাসের মধ্যে সাদা কাপড় পরিধান কর। কারণ, তা সব চাইতে উত্তম। আর ঐ সাদা কাপড় দ্বারা তোমাদের ম্যাইয়্যেতকেও কাফনাও।" *(আবু দাউদ ৩৫২৯ক, তিরমিযী ৯১৫ক, ইবনে মাজাহ ১৪৬১ক, আহমাদ ২১০৯ক)*

সম্ভব হলে তিন কাপড়ের মধ্যে একটি কাপড় চেক কাটা সাদা হওয়া উত্তম। কেননা, পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "কেউ মারা গেলে এবং তার পরিবারবর্গ কাফন দেওয়ার মত সামর্থ্য রাখলে তারা যেন চেক কাটা কাপড় দ্বারা তাকে কাফনায়।" *(আবু দাউদ ২৭৩৯ক, বাইহাকী ৩/৪০৩, সহীহ আবু দাউদ ২৭০২নং)*

অতএব কাফনের কাপড় একটি হলে সাদা মেঝের উপর চেক কাটা হওয়া মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে একাধিক হলে তার মধ্যে কিছু অথবা একটি কাপড় অনুরূপ চেক কাটা হওয়া উত্তম।

কাফনের কাপড়কে তিনবার আগর কাষ্ঠের সুগন্ধময় ধুঁয়া দিয়ে সুগন্ধময় করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা তোমাদের মাইয়্যেতকে সুগন্ধ ধুঁয়া দিয়ে সুগন্ধময় করবে, তখন যেন তা তিনবার কর।" *(আহমাদ ১৩০১৪ক, ইবনে শাইবাহ, মাওয়ারিদুয যামআন ৭৫২, হাকেম ১/৩৫৫, বাইহাকী ৩/৪০৫)*

আগর কাঠের ধুঁয়া না হলে গোলাপ পানি ইত্যাদি দ্বারাও সুগন্ধিত করা যায়। অবশ্য মুহরিমের কাফন এরূপ করা যাবে না। যেমন পূর্বোক্ত মৃত মুহরিমের হাসীসে উল্লিখিত হয়েছে।

অর্থশালী হলেও কাফন দেওয়ায় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা বৈধ নয়।

সুতরাং অতি মূল্যবান কাপড় কেনা বা তিন খন্ডের অধিক কাপড় দেওয়া শরীয়তের নির্দেশের পরিপন্থী। তাতে অর্থের অপচয় ঘটে, আর তা নিষিদ্ধ। তা ছাড়া মৃতের চাইতে জীবিত ব্যক্তিই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার। এ কথা বলেছেন আবু বকর ﷺ। *(আহকামুল জানাইয ৬৪ পৃঃ)*

তাই কাফনের কাপড় নতুন বা সেলাইবিহীন হওয়া জরুরী নয়। পুরাতন বা সিলাইযুক্ত (কামীস, আলখাল্লা লুঙ্গি, ইত্যাদি) কাপড়েরও কাফনানো যায়। যেমন পুরুষের পরিধেয় লেবাস দিয়ে মহিলাকে কাফনানো চলে নবী ﷺ-এর কন্যা যয়নাব ﷺ-কে তাঁর লুঙ্গি দিয়ে কাফনানো হয়েছিল। *(বুখারী ১২৫৩নং প্রমুখ)*

জীবিত অবস্থা থেকেই নিজের কাফন নিজেই প্রস্তুত করে রাখা দোষাবহ নয়। সাহাবাগণের কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ নবী ﷺ-এর নিকট থেকে তাঁর পরিধেয় কাপড় নিজের কাফন বানানোর জন্য চেয়ে নিতেন এবং তাতেই তাঁকে কাফনানো হত। *(দেখুন, বুখারী ১২৭৭ নং)*

পক্ষান্তরে কাফন উত্তম দিলে মাইয়্যেত কবরে গিয়ে অন্যান্য মওতার নিকট তা নিয়ে গর্ব করে এ ধারণা বিদআত। *(মু'জামুল বিদা' ১৩০পৃঃ)*

কাফনানোর পদ্ধতি

❖ প্রথমতঃ কাপড়ের মাপ নিম্নরূপ ঃ-

মাইয়্যেতের দেহের প্রস্থ ৩০সেমি হলে কাফনের (লেফাফার) প্রস্থ ৯০ সেমি হতে হবে। এইভাবে ৪০ সেমির ক্ষেত্রে ১২০ সেমি, ৫০ সেমির ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি, ৬০ সেমির ক্ষেত্রে ১৮০ সেমি; অর্থাৎ ৩ গুণ হবে।

মাইয়্যেতের দেহের দৈর্ঘ্য ১৮০ সেমি হলে লেফাফার দৈর্ঘ্য এর চেয়ে ৬০ সেমি অতিরিক্ত হতে হবে।

তদনুরূপ ১৫০ সেমির ক্ষেত্রে ৫০ সেমি, ১২০ সেমির ক্ষেত্রে ৪০ সেমি এবং ৯০ সেমির ক্ষেত্রে ৩০ সেমি কাপড় বেশী লম্বা লাগবে।

❖ দ্বিতীয়তঃ কাফনানোর পদ্ধতিঃ-

পদ্ধতি নং - ১

মাইয়্যেতকে সমান মাপের তিনটি কাপড়ে (লেফাফায়) কাফনানো হবে। কাফনদাতা পরস্পর তিনটি কাপড়কে বিছিয়ে দেবে। এর উপর প্রয়োজনে (মলদ্বার হতে নাপাকী বের হতে থাকলে) ১০০/২৫ সেমি কাপড়কে দুই মাথায় ফেড়ে নিয়ে লেঙ্গট বানিয়ে মাইয়্যেতের পাছার স্থানে রাখবে। (মুহরিম না হলে) তার উপর মিস্ক,কর্পূর বা অন্য কোন সুগন্ধি মিশ্রিত তুলো রাখবে। অতঃপর লাশকে পর্দার সাথে এনে তার উপর ধীরভাবে রাখবে। এখানেও কলেমার যিক্র নেই।

(মুহরিম না হলে) মাইয়্যেতের সিজদার স্থান সমূহে, বগলে, দুইরানের মধ্যবর্তী ইত্যাদি স্থানে আতর লাগিয়ে দেবে।

মাইয়্যেতের চোখে সুরমা লাগানোর ব্যাপারে কোন দলীল দেখলাম না। সুতরাং তা ব্যবহার না করাই উত্তম।

মাইয়্যেতের হাত দুটিকে পাঁজরের পার্শ্বে লম্বালম্বি করে ফেলে রাখবে। (অতঃপর লেঙ্গটটিকে সুবিধামত উভয় রানের সাথে বেঁধে দেবে।) এরপর ডান দিকের লেফাফার আঁচল ধরে ডান দিক এবং বাম দিকের আঁচল নিয়ে লাশের বাম দিক জড়িয়ে দেবে। এই অবসরে সতর্কতার সাথে লাশের লজ্জাস্থানের উপরে পর্দাটিকে টেনে বার করে নেবে।

এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেফাফাকে প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে জড়িয়ে দেবে। অতঃপর মাথার দিকের প্রথম বাঁধনে গাঁট দেবে। তারপর পায়ের দিকের বাঁধন বাঁধবে এবং দেহের মাঝে প্রয়োজন মত ১ থেকে ৫টা বাঁধন দেবে। বাঁধনের গাঁটগুলি হবে লাশের বাম দিকে। এতে কবরে লাশ কেবলা মুখে রেখে বাঁধনগুলি খুলতে সুবিধা হবে।

প্রকাশ যে, মুহরিমের চেহারা ও মাথা ঢাকা চলবে না। কারণ, প্রিয় নবী ﷺ পূর্বোক্ত সওয়ারী-পিষ্ট মুহরিমের ব্যাপারে বলেছিলেন, ওর দেহে খোশবূ লাগাবে না, ওর মাথা ও চেহারা ঢাকবে না। কারণ, কিয়ামতের দিন তালবিয়্যাহ পড়া অবস্থায় (মুহরিম) হয়েই) পুনরুত্থিত হবে।”

তবে মুহরিম মহিলা হলে কাফনে মাথা অবশ্যই জড়াতে হবে। কিন্তু মুখ না জড়িয়ে সাধারণভাবে উপরে পর্দা করতেই হবে। *(মুহাল্লা)*

পদ্ধতি নং -২

তিন কাপড়ের একটি হবে লুঙ্গী, একটি কামীস (জামা) এবং অপরটি লেফাফা। প্রথমে লেফাফা, এর উপর কামীস, তার উপর লুঙ্গী বিছাতে হবে। ডবল ভাঁজের কাপড় নিয়ে মাঝখানে গোল করে কেটে মাথা প্রবেশ করানোর মত জায়গা করে কামীসের নিম্নাংশ লুঙ্গীর নীচে বিছাবে এবং ঊর্ধ্বাংশ মাথার দিকে গুটিয়ে রেখে নেবে। কামীস ও লুঙ্গী পায়ের গাঁটের উপর অবধি লম্বা হবে। এর উপর ধীরভাবে লাশ শুইয়ে প্রথম পদ্ধতির ন্যায় সবকিছু করবে। প্রথমে লুঙ্গী জড়াবে তারপর কামীসের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে কামীসের উপর দিক লাশের বুক ও পায়ের উপর বিছিয়ে দেবে। অতঃপর লেফাফা জড়িয়ে উক্তরূপ বাঁধন বাঁধবে।

এরূপ কাফনের কথা আব্দুল্লাহ বিন আম্র ইবনুল আস প্রমুখাৎ প্রমাণিত। *(মুঅত্তা মালিক, শারহে যুরকানী ৫২৬নং)*

তবে ১ম নং পদ্ধতি মতে কাফন দেওয়াই উত্তম। কারণ, মহানবী ﷺ-কে উক্তরূপে কাফনানো হয়েছিল।

মহিলার কাফন

মহিলাদের কাফনও পুরুষদের অনুরূপ। যেহেতু মহিলাদের পাঁচ কাপড়ের কাফনের ব্যাপারে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়, সেটি যয়ীফ। *(দেখুন ইরওয়াউল গালীল ৭২৩নং, আল মুমতে' ৫/৩৯৩)* তদনুরূপ সাত কাপড়ের হাদীসও যয়ীফ। *(আহকামুল জানাইয টীকা ৬৪ পৃঃ)*

অবশ্য যাঁরা হাদীসটিকে হাসান (?) মনে করেন, তাঁরা পাঁচ কাপড় নিম্নরূপে দেন ঃ-

কাফনদাতা দুটি লেফাফা সমান মাপে কাটবে। ১টি কামীস এমন মাপে কাটবে; যাতে লাশের কাঁধ থেকে পায়ের গাঁট পর্যন্ত ঢাকা হয়। ডবল ভাঁজের কাপড় নিয়ে ভাঁজের মাঝখানে গোল করে কেটে মাথা প্রবেশ করার মত জায়গা করে নেবে। ইজার বা লুঙ্গী এমন মাপে কাটবে; যেন লাশের বগল থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত আবৃত হয়। খিমার বা ওড়না ৯০ বর্গসেমি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেফাফা দুটিকে উপরি উপরি বিছাবে। কামীসের পিঠের দিকটা বিছিয়ে বুকের দিকটা মাথার দিকে গুটিয়ে রাখবে। এরপর লুঙ্গীর কাপড় বিছাবে। ওড়না রাখবে পাশে। লেঙ্গটের প্রয়োজন হলে লুঙ্গীর উপর দেবে।

এরপর লাশকে পর্দার সাথে এনে কাফনের উপর রেখে তার হাত দুটিকে দুই পাঁজরের পাশে রাখবে। চুলের বেণীগুলো পিঠের নিচে ফেলে রাখবে। উল্লেখ্য যে, বুকের উপর চুল রাখা বিদআত। *(আহকামুল জানাইয, আলবানী, বিদআত নং ৩৬)*

অতঃপর (প্রয়োজন হলে লেঙ্গট বাঁধবে, নচেৎ) লাশের ডান দিকের লুঙ্গীর আঁচল নিয়ে তার ডান দিক এবং বাম দিকের আঁচল নিয়ে বাম দিক জড়িয়ে দেবে। এই সঙ্গে লাশের লজ্জাস্থানে স্থিত কাপড়টি সরিয়ে নেব। অতঃপর গুটিয়ে রাখা কামীসের উপরের অংশটি নিয়ে কাটা অংশের ফাঁকে মাথা প্রবেশ করিয়ে নিয়ে দেহের উপর বিছিয়ে দেবে এবং সাইডের বাকী অংশগুলি ডানে ও বামে পাঁজরের নিচে মুড়ে দেবে। তারপর ওড়না নিয়ে মাথা, চুল ,মুখমন্ডল ও বক্ষস্থল ঢেকে দেবে। এরপর লেফাফাদুটিকে পরস্পর ডান দিক থেকে ও পরে বাম দিক থেকে দেহে জড়িয়ে দেবে।

মাথা ও পায়ে বাঁধনের গাঁট দিয়ে মাঝে ১ থেকে ৫টি বাঁধন দেবে।

বলাই বাহুল্য যে, যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের উপর আমল শুদ্ধ নয়।

বিদায়ের এই অন্তিম মুহূর্তে, ওয়ারেসীন বা কর্তৃকপক্ষের কারো মাইয়্যেতকে ক্ষমা করতে বলার উদ্দেশ্যে সকলের নিকট করজোরে নিবেদন করার কথা শরীয়তে নেই। শরীয়তে যা আছে তা হল জীবিতাবস্থায় মাইয়্যেত নিজে ক্ষমা চাইবে। যেমন, পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য সুযোগ না পেলে সে কথা ভিন্ন।

এই কাফনানোর সময়েই ঘটা করে মাইয়্যেতের স্ত্রীকে নতুন লাল পেড়ে শাড়ি পরিয়ে লাশের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তার মোহরের দাবী মাফ করতে বলা বিদ্আত।

বলাই বাহুল্য যে, দেন মোহর এক প্রদেয় যৌতুক ও হক। যা বিবাহ বন্ধনকালে অথবা জীবিতাবস্থায় আদায় করা জরুরী ছিল। কিন্তু সে ঋণ পরিশোধে টাল-বাহানা করে অথবা ভ্রূক্ষেপ না করে অথবা স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে তাকে সোচ্চার হতে না দিয়ে তা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে সে যখন পরপারের জন্য নব সজ্জায় শীতল জড়পিন্ড হয়ে শায়িত, তখন যেন সে

নতুন আলতা পেড়ে শাড়ি পরিহিতা শয্যা-সঙ্গিনীর নিকট অন্তিম বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে (সমাজের মুখে) বলছে, 'ওগো প্রিয়া! এবার আমাকে ক্ষমা করে দাও। তোমার ঋণ পরিশোধে আমি অক্ষম। তোমার মোহরের দাবী মাফ করে দাও। আমাকে হিয়া খোসলে খালাস দাও।'

আহা! বেচারা বিরহ বেদনাহত টনটনে ব্যথিত বক্ষে তাই কি মৌখিক ক্ষমা না করে থাকতে পারে? কিন্তু কে জানে, হয়তো বা তার অন্তস্তলে এমন দাবী থেকে গেছে, যা সে মুখে প্রকাশ করতে লজ্জা অথবা ভয় করছে।

এতো শুধুমাত্র স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার মোহরের কথা। নচেৎ যদি ঐ মৃতব্যক্তি বিবাহের সময় দেওয়ার পরিবর্তে নিজে মোহর, ঘুষ, যৌতুক বা পণ নিয়ে স্ত্রীর অভিভাবককে দগ্ধ করে পথে বসিয়েছে, তাহলে তার বিষয়টা যে কত বড় গুরুতর, তার আন্দাজ সমাজই করবে।

পরন্তু যদি মাইয়্যেতের ত্যক্ত সম্পদ থাকে, তবে ওয়ারেসীনরা তার মোহর এবং অন্যান্যের ঋণ আদায় করে দেবে। মাফ করতে অনুরোধ করবে না। সম্পদ না থাকলে এমন অনুরোধ রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রেস্ত্রীরও উচিত, স্বামীকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা করা। এতে সে উত্তম বিনিময় পাবে পরকালে।

কাফনানোর সময় কাফনের ভিতরে কুরআনের কোন আয়াত বা দুআ লিখে ভরা, অথবা কাফনের কাপড়ের উপর লিখা, কোন অলীর শাজারা-নামা অথবা পীরের সুপারিশ-নামা (!) কাফনের সঙ্গে দেওয়া এবং আযাব মাফ বা লঘু হওয়ার আশা রাখা মস্ত বড় দুঃসাহসিকতা ও বিদআত।

জানাযার খাট (দোনজা)কে অথবা লাশকে আয়াত বা কলেমা-খচিত চাদর দ্বারা আবৃত করা এবং পুষ্পমন্ডিত করাও বিদআত। শেষোক্তটি বিজাতীয় প্রথা।

মাইয়্যেত মহিলা হলেই খাট ঢেকে পর্দা করা প্রয়োজন। কিন্তু হায়! যার সারা জীবন বেপর্দায় এবং পর্দার বিরুদ্ধে হাসাহাসি ও ভ্রূকুঞ্চনে কাটল, তাকে আর এ সময় পর্দা করে কতটা লাভ হবে? এর জবাব প্রত্যেক মহিলার পিতা, স্বামী এবং মেয়েরা নিজেই দেবে।

এই সময় বা যে কোন সময় স্মৃতি স্বরূপ লাশের কোন স্মারক ছবি তুলা অবৈধ।

জানাযা বহন

জানাযা (কাঁধে) বহন করা এবং দাফনের জন্য তার সঙ্গে যাওয়া ওয়াজেব (ফর্যে কিফায়াহ)। তা মুসলমানের একটি হক বা অধিকার; যা আদায় করা জরুরী।

পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "মুলিমের উপর মুসলিমের অধিকার (অন্য এক বর্ণনায়, মুসলিমের জন্য মুলিমের পক্ষে ওয়াজেব) হল ৫টি; সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করা, জানাযার অনুগমন করা, দাওয়াত গ্রহণ করা এবং হাঁচির (পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলে তার) জওয়াব দেওয়া।" *(বুখারী ১১৬৪ক, মুসলিম ৪০২২ক, ৪০২৩ক, আহমাদ ৮৪৯০ক প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ কর এবং জানাযার অনুসরণ কর (দাফন কার্যের জন্য যাও); তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেবে।"

জানাযার সাথে যাওয়া বা তার অনুগমন করার দুটি পর্যায় রয়েছে; প্রথমতঃ মড়াবাড়ি হতে জানাযার নামায পড়া পর্যন্ত। দ্বিতীয়তঃ মড়াবাড়ি থেকে দাফন বা লাশ কবরস্থ করা পর্যন্ত। এই উভয় প্রকার আমলই মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রমাণিত আছে। *(দেখুন মাওয়ারিদুয যামআন ৭৫৩নং, হাকেম ১/৩৫৩, ৩৬৪, ৩৬৫, বাইহাকী ৪/৭৪)*

তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মড়াবাড়ি থেকে নিয়ে দাফন কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত জানাযার অনুগমন করাটা কেবল জানাযা পড়ে ফিরে আসার চেয়ে বহুগুণে উত্তম। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মড়াবাড়ি থেকেই ঈমানের সাথে এবং নেকী লাভের আশায় জানাযার অনুগমন করে নামায পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার জন্য রয়েছে এক ক্বীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি তার দাফন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, তার জন্য রয়েছে দুই ক্বীরাত সওয়াব।"

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, ২ক্বীরাত পরিমাপ কেমন? উত্তরে তিনি বললেন, "দুটি বড় বড় পর্বতের মত।" অন্য বর্ণনায় তিনি বললেন,

"প্রত্যেক ক্বীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।" *(বুখারী ৪৫, ১২৪০ক, মুসলিম ১৫৭০, ১৫৭১ক, নাসাঈ ৪৯৪৬ক, আহমাদ ৯১৮৩ক)*

সুতরাং মুলিমের উচিত, অকারণে নিজেকে এই বিশাল পর্বতসম সওয়াব হতে এবং তার এক মুসলিম ভাইকে তার (দাফনের পর) দুআ হতে বঞ্চিত করে জানাযা পড়েই পালিয়ে না আসা।

অবশ্য এই সওয়াব কেবল পুরুষের জন্য; মহিলাদের জন্য নয়। কারণ, মহিলারা কোন জানাযার অনুগমন করতে পারে না। মহানবী ﷺ মহিলাদেরকে জানাযায় অনুগমন করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ৩০২ক, মুসলিম ১৫৫৫ক)*

জানাযার সাথে এমন কোন জিনিস নিয়ে যাওয়া বৈধ নয় যা শরীয়তের পরিপন্থী। সুতরাং উচ্ছরোলে বিলাপকারী বা মাতমকারী পুরুষ অথবা মহিলা কোন প্রকার ধূপধুনা, চন্দন বা আগর-কাঠের ধুঁয়া ইত্যাদি সুগন্ধি অথবা আগুন নেওয়া বা নিতে দেওয়া অবৈধ ও হারাম।

রসূল করীম ﷺ বলেন, "শব্দ বা আগুন নিয়ে জানাযায় অনুগমন করো না।" *(আবু দাউদ ২৭৫৭ক, আহমাদ ৯১৫০ক, হাদীসটি যয়ীফ হলেও এর সমর্থক আরো অন্যান্য হাদীস ও আসার রয়েছে। দেখুন আহকামুল জানায়েয ৭০ পৃঃ)*

আম্র বিন আস رضي الله عنه তাঁর অসিয়তে বলেছিলেন, 'আমি মারা গেলে আমার লাশের সাথে যেন কোন মাতমকারিণী ও আগুন না যায়।' *(মুসলিম ১৭৩ক, আহমাদ ১৭১১২ক)*

আবু হুরাইরা رضي الله عنه মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, 'আমার উপর তোমরা তাঁবু লাগায়ো না। আর কোন (সুগন্ধ কাঠের) ধুঁয়ো দেওয়ার পাত্র (ধুনুচি) বা আগুন নিয়ে আমার জানাযার অনুগমন করো না।' *(আহমাদ ৭৫৭৩, ৯৭৫৩ক)*

এই অনুগমনের সময় নিঃশব্দে শান্তভাবে চলতে হয়। কোন প্রকার বচসা, তর্ক, পার্থিব কথাবার্তা ইত্যাদি উচ্চরবে করা বা বলা ঠিক নয়। ক্বাইস বিন উবাদ বলেন, 'নবী ﷺ-এর সাহাবাগণ জানাযার সময়ে উচ্চস্বরকে অপছন্দ করতেন।' *(বাইহাকী ৪/৭৪)*

এই উপলক্ষ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা কোন আয়াত দ্বারা নিঃশব্দে অথবা সশব্দে যিক্র বিদআত। বরং এটা অমুসলিমদের অনুকরণে ভালো মনে করে কৃত কাজ। *(আহকামুল জানাইয দ্রষ্টব্য)*

তদনুরূপ জানাযার সাথে শোকের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাওয়া বা বাজানো তো

হারাম বটেই। *(ঐ)* এই সময় চাল-ডাল, খই-মুড়কী, মিঠাই, পয়সা ইত্যাদি সদকা করা বা ছড়ানো এবং ফুল ছড়ানো, জানাযার উপর পুষ্পার্ঘ নিবেদনাদি প্রথা বিদআত ও অবৈধ।

জানাযা বহন করার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি যেমন, পাল্টে পাল্টে খাটের চারটি পায়া ধারণ করে বহন ইত্যাদির ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এরূপ করাটা বিদআত। *(ঐ, বিদআত নং ৫০)*

মাইয়্যেত যদি ভালো লোক হয় তবে তাকে ভালো প্রতিদানের দিকে আগিয়ে দিতে এবং যদি মন্দ লোক হয় তবে নিজেদের দায় খালাস করতে শীঘ্র করা ওয়াজেব। সুতরাং জানাযা নিয়ে চলার সময় দ্রুতপদে চলা উচিত। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তোমরা জানাযা নিয়ে তাড়াতাড়ি চল। কেননা, সে যদি নেককার হয় তবে তো ভালো; ভালোকে তোমরা তাড়াতাড়ি তার ভালো ফলের দিকে পৌঁছে দেবে। আর যদি এর অন্যথা হয়, তবে সে খারাপ; খারাপকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দেবে।” *(বুখারী ১২৩১ক, মুসলিম ১৫৬৮ক, তিরমিযী ৯৩৬ক)*

তিনি আরো বলেন, “লাশ যখন খাটে রাখা হয় এবং লোকে তাকে তাদের কাঁধে বহন করতে শুরু করে, তখন সে যদি নেককার হয় তাহলে বলে, ‘আমাকে নিয়ে অগ্রসর হও।’ নচেৎ, বদকার হলে বলে, ‘হায় হায়! আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?’ আর তার এই শব্দ মানুষ ছাড়া সকলে শুনতে পায়। মানুষ শুনতে পেলে বেহুশ হয়ে যেত।” *(বুখারী ১৩১৪ নং, প্রমুখ)*

তবে যেন লাশের উপর কোন প্রকার ঝাঁকুনি না আসে সে কথাও খেয়াল রাখা দরকার।

উল্লেখ্য যে, মাইয়্যেত ভালো লোক হলে তার লাশের ওজন হাল্কা হবে এমন ধারণা ভিত্তিহীন ও বিদআত। *(আহকামুল জানাইয)* জানাযার সাথে চলার সময় তার আগে-পিছে ও ডানে-বামে চলা বৈধ। তবে সব ক্ষেত্রে লাশের কাছাকাছি থেকে চলা উত্তম। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ বলেন, “আরোহী ব্যক্তি জানাযার পশ্চাতে পশ্চাতে যাবে, যে হেঁটে যাবে সে পশ্চাতে, সামনে, ডাইনে ও বামে তার কাছা-কাছি চলবে। আর শিশুরও জানাযা পড়া হবে এবং তার পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা ও রহমত লাভের দুআ করা হবে।” *(আবু দাউদ ২৭৬৬, আহমাদ ১৭৪৭৫, তিরমিযী ৯৫২, নাসাঈ ১৯১৬, ইবনে মাজাহ ১৪৭০ক, সহীহ আবু দাউদ' ২৭২৩ নং)*

জানাযায় আগে ও পিছে উভয় ধরনের চলাই নবী ﷺ কর্তৃক প্রমাণিত। যেমন, আনাস ؓ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ, আবু বাকার ও উমার জানাযার সামনেও হাঁটতেন এবং পশ্চাতেও।' *(ত্বাহাবী ১/২৭৮)*

অবশ্য সকলের জন্য জানাযার পশ্চাতে চলাটাই উত্তম। কারণ, নবী ﷺ-এর উক্তি, "তোমরা জানাযার অনুগমন কর" উক্ত কথাই দাবী করে। কেননা, অনুগমন করার অর্থই হল পশ্চাতে পশ্চাতে চলা। আর এ কথার আরো সমর্থন করে হযরত আলী ؓ-এর উক্তি; তিনি বলেন, 'জানাযার আগে আগে চলার চাইতে পিছে পিছে যাওয়া সেই রকম উত্তম, যে রকম একা নামায পড়ার চাইতে জামাআতে নামায পড়া উত্তম।' *(ইবনে আবী শাইবাহ ৪/১০১, ত্বাহাবী ১/২৭৯, বাইহাকী ৪/২৫)*

গাড়ী ইত্যাদিতে সওয়ার হয়ে জানাযার অনুগমন বৈধ। তবে পায়ে হেঁটে যাওয়াটাই উত্তম। কারণ, এটাই ছিল নবী ﷺ-এর আমল। তাছাড়া এ কথাও প্রমাণিত নেই যে, তিনি কিছুতে সওয়ার হয়ে জানাযার সাথে গেছেন। বরং সওবান ؓ বলেন, 'একদা আল্লাহর রসূল ﷺ কোন জানাযার সাথে যাচ্ছিলেন। তাঁর নিকট এক সওয়ারী পেশ করা হলে তিনি তাতে চড়তে রাজী হলেন না। অতঃপর ফেরার পথে সওয়ারী পেশ করা হলে তিনি তাতে সওয়ার হলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "ফিরিশ্তাবর্গ পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাই তাঁরা পায়ে হেঁটে যাবেন আর আমি সওয়ার হয়ে যাব তা চাইলাম না। অতঃপর তাঁরা ফিরে গেলে সওয়ার হলাম।" *(আবু দাঊদ ২৭৬৩ক, হাকেম ১/৩৫৫, বাইহাকী ৪/২৩)*

সওয়ার হয়ে জানাযায় অনুগমন করলে জানাযার পশ্চাতে পশ্চাতে যেতে হবে। যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, "সওয়ার ব্যক্তি জানাযার পশ্চাতে পশ্চাতে যাবে---।" পক্ষান্তরে ফেরার পথে সওয়ার হয়ে আসা সর্বতোভাবে বৈধ; যেমন সওবান ؓ হাদীসের নির্দেশ।

পরন্তু সকলের জন্য জানাযার পশ্চাতে চলার সবচেয়ে ভালো। কারণ, পশ্চাতে চলাকেই অনুগমন করা বলা হয়। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

জানাযার জন্য নির্দিষ্ট গাড়ি বা যে কোনও গাড়িতে লাশ বহন করা এবং গাড়িতেই সকলের অনুগমন করা বিধেয় নয়। যেহেতু এরূপ অমুসলিমরা করে থাকে এবং তাদের অনুকরণ বৈধ নয়; যা বিদআত। *(আহকামুল জানাইয ৭৬-৭৭ পৃঃ)*

যেহেতু কাঁধে লাশ নিয়ে গেলে আখেরাতের স্মরণ দেবে; অন্য লোকেরা জেনে মৃতের জন্য দুআ করবে এবং এতে গর্ব ইত্যাদি হতে বাঁচা যাবে। পক্ষান্তরে ভারি বৃষ্টি, প্রচন্ড শীত বা গ্রীষ্ম অথবা লাশ বহন করার মত লোক না থাকলে গাড়ি ব্যবহারে দোষ নেই। *(সাবউনা সুআলান ফী আহকা-মিল জানাইয ২২পৃঃ)*

লাশ বহন করার সময় মাথাটা কোন দিকে থাকতে হবে তার কোন সিদ্ধান্ত শরীয়তে নেই। তবে মাথাটা সামনে দিকে থাকাটাই স্বাভাবিক ও উত্তম। *(ঐ ৩১পৃঃ)*

জানাযা দেখে খাড়া হওয়া এবং লাশ মাটিতে না রাখা পর্যন্ত অনুগামীদের দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ মনসূখ (রহিত)। আলী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ জানাযা দেখে দাঁড়িয়েছেন, আমরাও দাঁড়িয়েছি। অতঃপর তিনি বসেছেন, আমরাও বসেছি।' *(মুসলিম ১৫৯৯ক, ইবনে মাযাহ ১৫৩৩ আহমাদ ১০৪০ক)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'জানাযাতে শরীক হয়ে তিনি দন্ডায়মান থাকতেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি বসেছেন। *(মুঅত্তা মালেক ৪৯১ক, আবু দাউদ ২৭৬১ক, সহীহ আবু দাউদ ২৭১৮-নং)* আর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'জানাযায় শরীক হয়ে তা মাটিতে রাখা পর্যন্ত আল্লাহর রসূল ﷺ দাঁড়িয়েছেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অতঃপর পরবর্তীকালে তিনি বসেছেন এবং সকলকে বসতে আদেশও দিয়েছেন।' *(আহমাদ ৫৮৯ক, ত্বাহাবী ১/২৮২)*

যে ব্যক্তি জানাযা বহন করে তার জন্য ওযু করা মুস্তাহাব। যেমন নবী ﷺ এর হাদীস পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি মাইয়্যেতকে গোসল দেয় সে যেন গোসল করে এবং যে বহন করে যে যেন ওযু করে।"

জানাযার নামায

মুসলিম মাইয়্যেতের উপর জানাযার নামায পড়া ফর্যে কিফায়াহ (অর্থাৎ কিছু লোক তা পালন করলে বাকী লোকের কোন পাপ হয়না এবং কেউই পালন না করলে সকলেই পাপী হয়।) কারণ, এ নামায পড়তে আল্লাহর নবী ﷺ আদেশ করেছেন। যায়দ বিন খালেদ জুহানী বলেন, 'খাইবারের দিন নবী ﷺ-এর এক সাহাবী মারা গেলে সকলে তাঁকে খবর দিলেন। কিন্তু তিনি বললেন, "তোমাদের সঙ্গীর জানাযা তোমরা পড়।" এ কথা শুনে সকলের

চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কারণ বর্ণনা করে তিনি বললেন, "তোমাদের ঐ সাথী আল্লাহর পথে খেয়ানত করে মারা গেছে-----।" *(আবু দাউদ ২৩৩৫ক, নাসাঈ ২৯৩৩ক, ইবনে মাজাহ ২৮৩৮ক, আহমাদ ২০৮৬ক, প্রমুখ)*

অবশ্য দুই প্রকার মাইয়্যেতের জানাযা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। অর্থাৎ তাদের জানাযা পড়া ওয়াজেব নয়; তবে বিধেয় বটে।

প্রথম হল, নাবালক শিশু। কারণ, নবী ﷺ তাঁর শিশুপুত্র ইব্রাহীম ﷺ-এর জানাযা পড়েন নি। মা আয়েশা ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ-এর পুত্র ১৮ মাস বয়সে মারা যায়। তিনি তার জানাযা পড়েন নি।' *(আবু দাউদ ২৭৭২ক, আহমাদ ২৫১০১ক, সহীহ আবু দাউদ ২৭২৯নং)*

আর দ্বিতীয় হল শহীদ। কেননা, নবী ﷺ উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েন নি বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁর নামায না পড়াটা উক্ত ধরনের মাইয়্যেতের অবিধেয় হওয়ার নির্দেশ দেয় না।

বরং নিম্নোক্ত শ্রেণীর মাইয়্যেতের জানাযা পড়া ওয়াজেব না হলেও বিধেয়ঃ-

১। শিশু ঃ এমন কি গর্ভপাত-জনিত মৃত ভ্রূণেরও জানাযা পড়া বিধেয়। যেহেতু পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "শিশু (অন্য এক বর্ণনায়-গর্ভচ্যুত ভ্রূণে)র জানাযা পড়া হবে এবং তার পিতা-মাতার জন্যও ক্ষমা ও রহমত লাভের দুআ করা হবে।"

প্রকাশ যে, গর্ভচ্যুত ভ্রূণে রূহ ফুঁকার পর অর্থাৎ গর্ভধারণের পূর্ণ চার মাস পর মারা গিয়ে চ্যুত হলেই তার জানাযা পড়া বিধেয়। চার মাসের পূর্বেই চ্যুত হলে তার জানাযা পড়া বিধেয় নয়। কারণ, তাকে মাইয়্যেত বলা হয় না। কেননা, যার মধ্যে এখনো রূহ আসেনি এবং বিশেষ জীবন সঞ্চার হয় নি। তাকে মৃত বলা যায় না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (অর্থাৎ তার মূল উপাদান প্রথমে) ৪০ দিন তার মাতার গর্ভে শুক্ররূপে থাকে। অতঃপর ৪০ দিন লাল জমাট রক্ত পিন্ডরূপে অবস্থান করে, তৎপর ৪০ দিনে মাংস পিন্ডরূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তার নিকট এক ফিরিশ্তা পাঠিয়ে---- তার রূহ ফুঁকা হয়---।" *(বুখারী ২৯৬৯ক, মুসলিম ৪৭৮১ক, আবু দাউদ ৪০৮৫ক, মিশকাত ৮২ নং, দেখুনঃ আল মুমতে' ৫/৩৭৪)*

এ ক্ষেত্রে ভ্রূণের জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ মরা ভূমিষ্ট হলে ও যদি

চার মাসের বা ততোধিক বেশী বয়সের ভ্রূণ অথবা শিশু হয়, তাহলে তার জানাযা পড়া বিধেয়। আর উক্ত শর্তের যে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তা সহীহ নয়। *(দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ১৭০৪নং, আহকামুল জানাইয ৮১ পৃঃ)*

২। শহীদ ঃ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ উহুদের দিন নিহত হামযাকে (চেককাটা) চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে আদেশ করলেন। অতঃপর নয় তকবীর দিয়ে তার জানাযা পড়লেন। তারপর অন্যান্য নিহতদেরকে এনে সারাসারি রাখা হল এবং তিনি তাদের উপর ও তাদের সাথে তার উপরেও জানাযার নামায পড়লেন।' *(মাআনিউল আযার, ত্বাহাবী ১/২৯০)* এ ব্যাপারে এ ছাড়া আরো অন্যান্য হাদীসও রয়েছে।

৩। শরীয়তের কোন হদ্দ্ (দন্ডবিধি)তে নিহত ব্যক্তি ঃ ইমরান বিন হুসাইন বলেন, 'জুহাইনাহ গোত্রের এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এল। তখন সে ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী ছিল। এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! হদ্দের উপযুক্ত এক কাজ আমি করে ফেলেছি, আপনি তা আমার উপর কায়েম করুন।' নবী ﷺ তার অভিভাবককে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "এর প্রতি সদ্ব্যবহার কর। অতঃপর সন্তান প্রসব করার পর ওকে আমার নিকট নিয়ে এস।" সুতরাং তাই করা হল। আল্লাহর নবী ﷺ তার দেহের কাপড় শক্ত করে বাঁধতে আদেশ করলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার আদেশ দিলেন। মরার পর তিনি তার জানাযা পড়লেন। উমার ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি ওর জানাযা পড়লেন, অথচ ও ব্যভিচার করেছিল?!' উত্তরে প্রিয় নবী ﷺ বললেন, "কিন্তু ও এমন তওবা করে নিয়েছিল যে, যদি তা মদীনার ৭০ জন লোকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত, তবে তাদের জন্য তা যথেষ্ট হত। আর এর চেয়ে উত্তম তওবা কি পেয়েছ যে, সে আল্লাহ তাআলার জন্য নিজের প্রাণ হত্যা করালো?!" *(মুসলিম ৩২০৯ক, তিরমিযী ১৩৫৫ক, নাসাঈ ১৯৩১ক, আবু দাউদ ৩৮৫২ক, ইবনে মাজাহ ২৫৪৫ক)*

৪। আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যাচরণে লিপ্ত, কাবীরা গোনাহর গোনাহগার ব্যক্তি ঃ ওয়াজেব বর্জন এবং হারাম গ্রহণে জড়িত থাকা অবস্থায় মৃত ফাসেক, ফাজের, পাপাচার, দুরাচার ও দুস্কৃতী ব্যক্তি; যেমন, নামায ও যাকাত ফরয জানা ও মানা সত্ত্বেও যে তা ত্যাগ করে, ব্যভিচার করে, মদ্য পান

করে, খেয়ানত করে, আত্মহত্যা করে, অথবা অনুরূপ কোন পাপ করে মারা যায় তার জন্যও জানাযা পড়া বিধেয়। তবে উলামা, ইমাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উচিত, এমন লোকদের জানাযা না পড়া। যাতে ওদের ন্যায় জীবিত অন্যান্য পাপীরা এ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ পায়। প্রিয় নবী ﷺ অনুরূপ করে গেছেন।

আবু কাতাদাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-কে যখন কোন জানাযা পড়ার জন্য ডাকা হত তখন তিনি মৃতব্যক্তি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। অতঃপর লোকেরা তার নাম ও প্রশংসা করলে জানাযা পড়তেন। নচেৎ তার পরিজনকে বলতেন, "তোমাদের জানাযা তোমরাই পড়গে!" এবং তিনি তার জানাযা পড়তেন না। *(আহমাদ ২২৫১৩ক, হাকেম ১/৩৬৪)*

যায়দ বিন খালেদ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) কোন কিছু খেয়ানত করলে নবী ﷺ তার জানাযা না পড়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়। (আমি পড়ব না।) কারণ, তোমাদের সঙ্গী আল্লাহর রাস্তায় খেয়ানত করেছে!" *(মুঅত্তা, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, হাকেম ২/১২৭, আহমাদ ৪/১১৪, ৫/১৯২)*

অনুরূপ একজন আত্মহত্যা করে মারা গেলে তার জানাযাও তিনি পড়েন নি। *(মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরনমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম ১/৩৬৪, বাইহাকী ৪/১৯, আহমাদ ৫/৮৭ প্রভৃতি)*

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, আত্মহত্যা করে মৃতের জানাযা ইমাম পড়বেন না। বরং অন্যান্য লোকেরা পড়ে নেবে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, যিনি হত্যাকারী, খেয়ানতকারী, ঋণগ্রস্ত প্রভৃতি পাপীদের উপর তাদের মত অন্যান্য পাপীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জানাযা না পড়েন, তিনি ভালোই করেন। তবে যদি তিনি প্রকাশতঃ এমন পাপীর জানাযা না পড়েন এবং গোপনভাবে তার জন্য দুআ করেন তাহলে দুটির মধ্যে একটি কল্যাণ হাতছাড়া না হয়ে উভয় প্রকার কল্যাণই লাভ করা সম্ভব হয়।' *(আল- ইখতিয়ারাত ৫২ পৃঃ আহকামুল জানাইয ৮৪ পৃঃ)* অর্থাৎ এমন করলে পাপীদেরকে শিক্ষাও দেওয়া যায় এবং গোপনে দুআও মৃতের জন্য ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া নেক লোকের চাইতে বদ লোকেরাই তো দুআর অধিক মুখাপেক্ষী।

যারা নামায, যাকাত প্রভৃতি ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করে তারা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে কাফের। এদের জানাযা কারো নিকটেই কারো জন্য পড়া বৈধ নয়। আবার যাঁদের মতে ফরয মানা সত্ত্বেও অবহেলায় নামায ত্যাগকারী কাফের তাঁদের মতেও এমন বেনামাযীদের জানাযা কোন মুসলিমই পড়তে পারে না এবং তার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার ক্ষমা প্রার্থনার দুআ করা যাবে না। বরং তাকে কাফের ও মুর্তাদ্দ- এর মত মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। *(দেখুন, হুকমু তা-রিকিস সালাহ, ফাতাওয়াহ তা'যিয়াহ ১৪ পৃঃ সাবউনা সুআলান ফী আহকামিল জানাইয ২০ পৃঃ, ইবনে বাযের বিভিন্ন ফতোয়া)*

৫। এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার এমন কোন ত্যক্ত সম্পদ নেই যাতে ঋণ পরিশোধ হতে পারে। এরূপ ব্যক্তির জানাযা পড়া বিধেয়। তবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইমাম পড়বেন না। অবশ্য তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব ইমাম নিজে অথবা অন্য কেউ নিলে তার জানাযা সকলেই পড়বে।

সালামাহ বিন আক্‌ওয়া' বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে একটি জানাযা উপস্থিত হলে লোকেরা তাঁকে তার জানাযা পড়তে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর কি ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" সকলে বলল, 'না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়লেন।

এরপর আর একটি জানাযা উপস্থিত হলে সকলে তাঁকে তার জানাযা পড়তে অনুরোধ করল। তিনি তার সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলা হল, 'হ্যাঁ।' বললেন, " ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'তিন দীনার।' তা শুনে তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তৃতীয় জানাযা উপস্থিত হলে এবং লোকেরা শেষ নামায পড়তে আবেদন জানালে তার সম্বন্ধেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' বললেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলল, " তিন দীনার।"

একথা শুনে তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" তখন আবু কাতাদাহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ওর জানাযা আপনি পড়ুন। আমি ওর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিচ্ছি।' *(বুখারী ২১২৭ক, নাসাই ১৯৩৫ক, আহমাদ ১৫৯১৩ক)*

জাবের ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, (নবী ﷺ প্রথমতঃ ঋণগ্রস্ত মৃতের জানাযা পড়তেন না।) অতঃপর যখন বহু বিজয় ও সম্পদ লাভ হল, তখন তিনি বললেন, "মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে আমিই অধিক হকদার দায়িত্বশীল। সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং যে সম্পদ রেখে মারা যাবে তার অধিকারী হবে তার ওয়ারেসীনরা।" *(মুসলিম ১৪৩৫ক, নাসাঈ ১৯৩৬ক, আবু দাউদ ২৫৬৫ক, ইবনে মাজাহ ৪৪ক, প্রমুখ)*

অনুরূপ বর্ণিত আছে আবু হুরাইরা কর্তৃকও। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ও ৩০৪১ নং)*

৬- যে মাইয়্যেতকে পূর্বে জানাযা পড়ে কবরস্থ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু লোক যারা এই জানাযায় শরীক হতে পারে নি তারা তার কবরকে সামনে রেখে জামাআত করে বা একাকী কেউ জানাযার নামায পড়তে পারে। অবশ্য জামাআত করে পড়লে যেন এই ইমাম পূর্বে তার জানাযা না পড়ে থাকে।

পক্ষান্তরে মুক্তাদীগণ ডবল করেও পড়তে পারে। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵁ বলেন, 'এক ব্যক্তিকে তার পীড়িত অবস্থায় নবী ﷺ সাক্ষাতে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সে মারা গেলে তাকে রাতে-রাতেই দাফন করে দেওয়া হল। অতঃপর সকাল হলে সে কথা তাঁর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "আমাকে তার মৃত্যু খবর জানাতে তোমাদের কি বাধা ছিল?" সকলে বলল, 'গভীর রাত্রি ছিল আর অন্ধকারও ছিল খুব বেশী। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে আমরা অপছন্দ করলাম। এ শুনে তিনি তার কবরের নিকট এসে তার জানাযা পড়লেন। তিনি আমাদের ইমামতি করলেন। আমরা তাঁর পশ্চাতে কাতার দিয়েছিলাম। ঐ কাতারে আমিও শামিল ছিলাম। তিনি তাঁর জন্য চার তকবীর দিয়ে নামায পড়লেন।' *(বুখারী ১১৭০ক, মুসলিম ১৫৮৬ক, তিরমিযী ৯৫৮ক, ফাতহুল বারী হাদীস নং ১৩২৬)*

অতএব কোন কারণবশতঃ যদি কোন মাইয়্যেতকে জানাযা না পড়েই দাফন করা হয়ে থাকে, তাহলে তার কবরে যাওয়া সম্ভব হলে কবরের উপর জানাযা পড়া বিধেয়। আর এর জন্য গায়েবানা জানাযা বিধেয় নয়।

৭- যে মাইয়্যেত এমন স্থানে মারা গেছে, যেখানে জানাযা নামায পড়ার মত কেই ছিল না অথবা তাকে জানাযা না পড়েই দাফন করা হয়েছে জানা গেলে এবং সেই স্থানে যাওয়া সম্ভব না হলে অথবা লাশ পাওয়া অসম্ভব হলে সে

ক্ষেত্রে ঐ মাইয়্যেতের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া বিধেয়। বাদশা নাজাশী হাবশায় মারা গেলে তার খবর পেয়ে নবী ﷺ সাহাবাদেরকে সঙ্গে করে তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬৫২নং)*

কিন্তু প্রত্যেক মাইয়্যেতের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া নবী ﷺ-এর তরীকা ও আদর্শ ছিল না। যেহেতু বহু সাহাবাই মদীনার বাইরে নবী ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন, কই তাঁদের গায়েবী জানাযা তিনি পড়েন নি।

সুতরাং যে মাইয়্যেতের উপর কিছু মুসলিম জানাযার নামায পড়ে তাকে দাফন করেছে বলে জানা যায়, তার জন্য আর গায়েবানা জানাযা পড়া বিধেয় নয়। বরং এই ধরনের প্রত্যেক (জানাযা পড়ে দাফন কৃত) মাইয়্যেতের উদ্দেশ্যে গায়েবানা জানাযা পড়া ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা পড়তে মুসলিম জনসাধারণকে আবেদন করা বিদআত। *(দেখুন আহকামুল জানাইয ৯১-৯৩পৃঃ, সাবউনা সুআলান ফী আহকামিল জানাইয ৮-৯পৃঃ, ফাতাওয়াত তা'যিয়াহ ১৮-১৯পৃঃ)*

কাফের, মুনাফেক, মুশরিক, কবর বা মাযারপূজারী, (এবং অনেকের মতে বেনামাযী)র জন্য জানাযার নামায, দুআ, ক্ষমা প্রার্থনা, এবং তাদের উদ্দেশ্যে 'রাহিমাহুল্লাহ' বলা হারাম। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং (ক্ষমা প্রার্থনার জন্য) তার কবর পার্শ্বে দাঁড়াবে না; ওরা তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে। *(সূরা তাওবাহ ৮৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয়; যখন তাদের নিকট এ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা

দোযখবাসী। *(ঐ ১১৩ আয়াত)*

মৃত্যুর খবর শুনে অথবা জানাযা পড়ার সময় যদি কারো পাকা সন্দেহ হয় যে, মাইয়্যেত হয়তো শির্ক করে বা নামায ত্যাগ করে মারা গেছে, তবে তার জন্য দুআতে সন্দেহ বা শর্তমূলক শব্দ ব্যবহার করায় দোষ নেই। অতএব দুআয় বলা যায় যে, 'আল্লাহ! ওকে মাফ করে দাও; যদি ও মুমিন হয়। আল্লাহ! ওর প্রতি রহম কর; যদি ও তওহীদবাদী মুসলিম হয়---' ইত্যাদি। পক্ষান্তরে সন্দেহ পাকা না হলে অনুরূপ শর্তমূলক শব্দ ব্যবহার বৈধ নয়। কারণ মুসলিম মাত্রেই আসল ও মৌলিক চরিত্র হল তওহীদবাদী ও মুমিন হওয়া। সুতরাং তাতে সন্দেহ হওয়ার কথা নয়।

শর্তমূলক দুআ করার বৈধতার ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহতে বর্তমান। আল্লাহ তাআলা লিয়ানের আয়াতে বলেন, "পঞ্চমবারে (পুরুষ) বলবে ও যদি (তোর স্ত্রীর ব্যভিচারে অপবাদে) মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

তদনুরূপ স্ত্রীও পঞ্চমবারে বলবে, তার নিজের উপর আল্লাহ গযব, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়।" *(সূরা নূর ৭,৯ আয়াত)*

অনুরূপভাবে কুফার আমীর সা'দ বিন আবী অক্কাসের বিরুদ্ধে উসামাহ বিন কাতাদাহ খলীফা উমার ﷺ-এর নিকট দাঁড়িয়ে অবিচারের অভিযোগ করলে সা'দ ﷺ শর্তমূলক শব্দে দুআ করে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! যদি এই ব্যক্তি লোক প্রদর্শন ও সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাহলে ওকে অন্ধ করে দিও, ওর হায়াত দারাজ করো এবং ফিতনায় পতিত করো।' *(বুখারী ৭৫৫ নং)*

আর নবী ﷺ তালবিয়্যাহ পাঠের সময় যুবাআহ বিন্তে যুবাইরকে বলেছিলেন "তুমি যা শর্ত লাগাবে তাই তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি প্রাপ্ত হবে।" *(দারেমী ১৭৫৬নং)* এই উক্তির সাধারণ ইঙ্গিতও দুআতে শর্ত লাগানো বৈধ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

তবে জানাযার সময় মাইয়্যেত জীবিতকালে নামায পড়েছে কি না---সে প্রশ্ন করা মুক্তাদীর দায়িত্ব নয়। বরং এ সময় তার দ্বীনদারী বিষয়ে কাউকে প্রশ্ন করাই হল বিদআত। *(ফাতাওয়াত তা'যিয়াহ ১৩-১৪ পৃঃ)*

পক্ষান্তরে বেদ্বীন বা বেনামাযীর জানাযা পড়ার জন্য ইমাম বা অন্য

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অনুরোধ করা ওয়ারেসীন বা অভিভাবকের অনুচিত। কারণ, এমনটি করা তাদের জন্য অবৈধ। যেমন, যদি কেউ এমন লোকের জানাযা না পড়ে, তবে তার প্রতি রাগ বা ক্ষোভ রাখা উচিত নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন)*

জানাযার নামাযের জন্য আযান-ইকামত নেই। তাই সাধারণভাবে মাইকে নামাযের ঘোষণা ও কবরস্থানের প্রতি সাধারণকে আহবান অবশ্যই বিদআত।

পক্ষান্তরে এক অপরকে নামাযের নির্দিষ্ট সময় বলে মুসল্লী সংখ্যা বৃদ্ধি করা দূষণীয় নয়। *(সাবঊনা সুআলান ফী আহকামিল জানাইয ৫পৃঃ)*

জানাযার নামাযের জন্য জামাআত ওয়াজেব; যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য ওয়াজেব। কারণ, নবী ﷺ সর্বদা জামাআত সহকারেই জানাযা পড়েছেন। *(আহকামুল জানাইয ৯৭পৃঃ)*

আর জামাআতে লোক যত বেশী হবে ততই মাইয়্যেতের জন্য উত্তম ও সৌভাগ্য-ব্যঞ্জক। কারণ, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে মাইয়্যেতের জন্য ১০০ জন মত মুসলিমের জামাআত জানাযা পড়ে প্রত্যেকে তার জন্য সুপারিশ করলে (আল্লাহর দরবারে) তাদের সুপারিশ মঞ্জুর করা হয়।" *(মুসলিম ১৫৭৬ক, তিরমিযী ৯৫০ক, নাসাঈ ১৯৬৪ক, আহমাদ ১৩৩০৩ক)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১২০৯নং)*

অবশ্য মুসল্লীর সংখ্যা একশতের চাইতে কম হলেও মাইয়্যেত ক্ষমার্হ হতে পারে। যেমন যদি মাত্র ৪০ জন এমন লোক মাইয়্যেতের জন্য সুপারিশের দুআ করে, যারা কোনদিন কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে কোন প্রকারে শরীক (শির্ক) করে নি - তাহলে তাদের সুপারিশও তাঁর দরবারে মঞ্জুর হয়। এ ব্যাপারে পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিম মারা গেলে তার জানাযায় যদি ৪০ জন এমন লোক নামায পড়ে যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নি, তাহলে আল্লাহ তাদের সুপারিশ তার জন্য কবুল করে নেন।" *(মুসলিম ১৫৭৭ক, আবু দাউদ ২৭৫৬ক, ইবনে মাজাহ ১৪৭৮ক, আহমাদ ২২৭৯ক)*

এই জামাআতে ইমামের পশ্চাতে তিনটি কাতার হওয়া মুস্তাহাব। আবু উমামাহ ﵁ বলেন, 'একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক মাইয়্যেতের জানাযার নামায পড়লেন। তখন তাঁর সাথে মাত্র সাতটি লোক ছিল। তিনি তিন ব্যক্তি দ্বারা একটি কাতার আর দুই ব্যক্তি দ্বারা একটি কাতার এবং অপর দুটি ব্যক্তি

দ্বারা আর একটি (মোট তিনটি) কাতার করে দাঁড় করালেন।' *(ত্বাবারানী কাবীর, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৪৩২)*

মালেক বিন হুবাইরাহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে যদি তার জন্য মুসলিমদের, তিন কাতার লোক জানাযা পড়ে, তাহলে তার জন্য (জান্নাত) অবধার্য হয়ে যায়।" (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।")

মারযাদ বিন আব্দুল্লাহ ইয়াযানী বলেন, 'মালেক বিন হুবাইরা (﵁) জানাযার অংশগ্রহণকারী লোক কম দেখলে সকলকে তিন কাতারে ভাগ করে দিতেন।' *(আবু দাউদ ২৭৫৩ক, তিরমিযী ২৭১৪নং)*

কোন জানাযায় যদি ইমাম ব্যতীত অন্য একটি লোক ছাড়া আর কোন লোক না থাকে, তাহলে অন্যান্য নামাযের মত ইমাম-মুক্তাদী পাশাপাশি দাঁড়াবে না। বরং ইমামের পশ্চাতে একাকী দাঁড়িয়ে জানাযা পড়বে। কারণ, আব্দুল্লাহ বিন আবী তালহা বলেন, 'উমাইর বিন আবু তালহা ইন্তেকাল করলে তালহা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ডেকে পাঠালেন, তিনি এসে তাদের বাড়িতে জানাযা পড়লেন; আল্লাহর রসূল ﷺ সামনে দাঁড়ালেন। আবূ তালহা দাঁড়ালেন তাঁর পিছনে এবং উম্মে সুলাইম দাঁড়ালেন আবু তালহার পিছনে। সে দিন ওঁরা ছাড়া তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না।' *(হাকেম ১/৩৬৫, বাইহাকী ৪/৩০-৩১, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৩৪)*

এই জামাআতের কাতারে গোলাপ পানি বা কোন সেন্ট্ ছিটানো বিদআত।

উক্ত নামাযে ইমামতির অধিক হকদার মুসলিমদের সাধারণ গভর্নর বা আমীর অথবা তার নায়েব।

আবু হাকেম বলেন, 'হাসান বিন আলী ﵁ যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিন আমি তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখলাম, হুসাইন বিন আলী ﵁ সাঈদ বিন আসকে তাঁর ঘাড়ে স্পর্শ করে বললেন, 'আগে বাড়ুন। (ইমামতি করুন।) যদি তা সুন্নাহ না হত তাহলে আমি আপনাকে বাড়াতাম না।' সাঈদ ছিলেন তৎকালীন মদীনার আমীর। আর তাঁদের আপোসে কোন প্রকার মনোমালিন্য ছিল। *(হাকেম ৩/১৭১, বাইহাকী ৪/২৮)*

কিন্তু গভর্নর, আমীর অথবা নায়েব না থাকলে বা উপস্থিত না হলে ইমামতির

হকদার তিনিই বেশী যিনি পাঁচ-অক্ত্ নামাযে হকদার। যেমন প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “লোকেদের ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কুরআন (উত্তম ও বেশীরূপে) পাঠ করে। কুরআন পাঠে তারা সমমানের হলে যে ব্যক্তি সুন্নাহ বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখে সে ইমামতি করবে। এতেও তারা সমমানের হলে প্রথম হিজরতকারী , তাতেও সমান হলে প্রথম যে মুসলিম হয়েছে সে ইমামতি করবে। আর কোন ব্যক্তি যেন কারো ইমামতির জায়গায় ইমামতি না করে এবং কারো আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে।” *(মুসলিম ১০৭৮ক, আবু দাউদ ৪৯৪ক, তিরমিযী ২১৮ক, নাসাঈ ৭৭২ক, ইবনে মাযাহ ৯৭০ক, আহমাদ ১৬৪৪৬ক)*

সুতরাং উক্তরূপ উপযুক্ত যে কেউই না বালক হলেও ইমামতি করতে পারবে, আর জানাযা মসজিদে হলে ইমামতি করবেন মসজিদের ইমাম সাহেব। অবশ্য তাঁর অনুমতিক্রমে অন্য কেউ পড়তে পারে।

কিন্তু মৃতব্যক্তি জীবিতকালে যদি তার জানাযা পড়তে কাউকে অসিয়ত করে যায়, তাহলে অসী ব্যক্তিই ইমামতি করবে। জানাযায় আমীর উপস্থিত না থাকলে অথবা জানাযা মসজিদে না হলে এবং সব দিকে উপযুক্ত হলে তবেই কোন আত্মীয় ইমামতি করবে।

একই সময়ে একাধিক মাইয়্যেত একই স্থানে জমায়েত হলে একবারই জানাযা পড়া সকলের জন্য যথেষ্ট। পুরুষ ও শিশু হলে ইমামের সম্মুখে পুরুষ থাকবে। মহিলা ও শিশুপুত্র হলে ইমামের সামনে শিশু থাকবে। পুরুষ, মহিলা ও শিশুপুত্র হলে ইমামের সম্মুখে পুরুষ, অতঃপর শিশুপুত্র অতঃপর, মহিলা থাকবে। আর পুরুষ, মহিলা, শিশুপুত্র ও শিশুকন্যা থাকলে ইমামের সম্মুখে পুরুষ, অতঃপর শিশুপুত্র, অতঃপর মহিলা এবং শেষে কেবলার দিকে শিশুকন্যা থাকবে। মাইয়্যেত কেবল মহিলা ও শিশুকন্যা হলে ইমামের সম্মুখে মহিলা ও পরে শিশুকন্যা কেবলার দিকে থাকবে।

ইবনে উমার একদা এক সঙ্গে ৯ টি মাইয়্যেতের উপর জানাযার নামায পড়লেন। এতে পুরুষ মাইয়্যেতদেরকে ইমামের (নিজের) দিকে রাখলেন এবং মহিলা মাইয়্যেতদের রাখলেন কেবলার দিকে। সকল লাশকে রাখলেন একই কাতারে। আর উমার বিন খাত্তাবের স্ত্রী উম্মে কুলযূম বিন্তে আলী এবং তার

যায়দ নামক এক ছেলের জানাযা রাখলেন এক সাথে। তখন ইমাম (গভর্নর) ছিলেন সাঈদ বিন আস। ঐ জামাআতে ছিলেন ইবনে আব্বাস, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ ও আবূ কাতাদাহ ﷺ। ইবনে উমার কিশোরটিকে নিজের দিকে কাছাকাছি রাখলেন। এক ব্যক্তি বলেন, 'আমি এতে আপত্তি করলাম। অতঃপর ইবনে আব্বাস, আবূ হুরাইরাহ, আবূ সাঈদ ও আবূ কাতাদার দিকে দৃকপাত করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি?' তাঁরা বললেন, 'ওটাই সুন্নাহ।' *(নাসাঈ ১৯৫২ক, বাইহাকী ৪/৩৩, দারাকুত্বনী ১৯৪নং)*

এক সঙ্গে একই শ্রেণীর মাইয়্যেত জমায়েত হলে ইমামের কাছাকাছি সেই ব্যক্তিকে রাখা হবে যে অধিক (শুদ্ধভাবে) কুরআন পাঠকারী (হিফ্যকারী) এবং অধিক দ্বীনদার। কারণ নবী করীম ﷺ উহুদের শহীদদেরকে কবরস্থ করার সময় সেই ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে কবরে রাখতে আদেশ করেছিলেন, যে ব্যক্তি অধিক কুরআন পাঠকারী (হিফযকারী)। যাতে নির্দেশ রয়েছে যে, সব চেয়ে অধিক কুরআন, সুন্নাহ বা দ্বীন বিষয়ে জ্ঞান রাখে আমল করে। *(দেখুন সাবউনা সুআলান ফী আহকামিল জানাইয ১০পৃঃ)*

পরন্তু প্রত্যেক মাইয়্যেতের জন্য পৃথকভাবে পৃথক-পৃথক জানাযাও পড়া যায়। মৌলিক নিয়ম হল এটাই। তাছাড়া উহুদের দিন মহানবী ﷺ শহীদদের জানাযা পৃথক-পৃথক ভাবেই পড়েছিলেন। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ যখন হামযা ﷺ-এর জানাযা পড়ার জন্য দাঁড়ালেন তখন তাঁকে কেবলার দিকে রাখতে আদেশ করলেন। অতঃপর নয় তকবীর দিয়ে তার জানাযা পড়লেন। তারপর অন্যান্য শহীদগণকে তাঁর নিকট আনা হল। এক একজন শহীদকে হামযা ﷺ-এর পাশে রেখে জানাযা পড়লেন। এভাবে তিনি সকল শহীদগণের সাথে হামযা ﷺ-এর উপরও সর্বমোট বাহাত্তর বার জানাযা পড়লেন।" *(ত্বাবারানী কাবীর ৩/ ১০৭- ১০৮)*

মসজিদের ভিতর জানাযা পড়া বৈধ। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'সা'দ বিন আবী অক্কাসের ইন্তেকাল হলে নবী ﷺ-এর পত্নীগণ বলে পাঠালেন, যেন তাঁর লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় মসজিদ বেয়ে অতিক্রম করা হয়; যাতে তাঁরা তাঁর উপর জানাযার নামায পড়তে পারেন। সুতরাং লোকেরা তাই করল এবং তাদের হুজরার পাশে লাশ রাখা হলে তাঁরা সকলে জানাযা পড়লেন। অতঃপর তাঁর লাশ নিয়ে লোকেরা মাক্বাইদ (প্রয়োজনে বসা ও ওযুর জন্য নির্ধারিত

স্থানে)এর পার্শ্ববর্তী 'বা-বুল জানাইয' (জানাযা গেট) দিয়ে বের হয়ে গেল। পরবর্তীকালে নবী ﷺ-এর পত্নীগণের নিকট খবর পৌঁছল যে, মসজিদে জানাযা পড়ার দরুন লোকেরা তাদের নিন্দা গাইছে; বলছে, 'মসজিদে কোন দিন জানাযা প্রবেশ করানো হত না!' হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট খবর গেলে তিনি বললেন, 'লোকেরা এত তাড়াতাড়ি সে বিষয়ে কেন নিন্দা গায়, যে বিষয়ে তাদের মোটেই কোন জ্ঞান নেই?! মসজিদে জানাযা নিয়ে আসার জন্য তারা নিন্দা গায়! অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ সুহাইল বিন বাইযা ও তার ভায়ের জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন।' *(মুসলিম ৯৭৩নং, তিরমিযী ৯৫৪ক, নাসাই ১৯৪২ক, প্রমুখ)*

তবে আফযাল ও উত্তম হল মসজিদ ছাড়া জানাযার জন্য বিশিষ্ট স্থান মুসাল্লায় (বা ঈদগাহে - যদি তা কবর স্থানের ধারে বা পথে হয়, তাহলে সেখানে) জানাযার নামায পড়া নবী ﷺ-এর যুগে জানাযার জন্য বিশিষ্ট মুসাল্লা পরিচিত ছিল। আর আল্লাহর রসূল ﷺ-এর অধিকাংশ আমলই ছিল এই মুসাল্লায় নামায পড়া।

ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'একদা ইহুদীরা তাদের একজন (বিবাহিত) পুরুষ ও মহিলাকে ধরে এনে নবী ﷺ-এর নিকট শাস্তির দাবী করলে তিনি তাদেরকে রজম করে (পাথর ছুঁড়ে) মেরে ফেলতে আদেশ করলেন। সুতরাং তাদেরকে মসজিদের পাশে জানাযার মুসাল্লার নিকট রজম করা হল।' *(বুখারী ১২৪৩, ৪১৯০, ৬৭৮৭ক, মুসলিম ৩২১১ক)*

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ ﷺ বলেন, 'একদা আমরা মসজিদের আঙ্গিনায় - যেখানে জানাযা রাখা হয় সেখানে - বসে ছিলাম। আর আল্লাহর রসূল ﷺ বসে ছিলেন আমাদের মাঝে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃকপাত করলেন----।' *(আহমাদ ২১৪৫৫ ক, হাকেম ২/২৪)*

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যেদিন বাদশা নাজাশী ইন্তেকাল করেন সেদিন তাঁর মৃত্যু-খবর দিলেন এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে মুসাল্লায় বের হয়ে গেলেন। অতঃপর চার তকবীর দিয়ে (গায়েবানা) জানাযা পড়লেন।' *(বুখারী ১১৬৮ক, মুসলিম ১৫৮০ক)*

<u>মহিলারা জানাযা নামায পড়তে পারে</u>; তবে মসজিদে। মসজিদের বাইরে

কোন স্থানে নয়। যেমন, এর নির্দেশ পূর্বোক্ত আয়েশা (রাঃ)এর হাদীসে রয়েছে।

কবরস্থানে (পুরাতন কবরের উপর কবরস্থান বলে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত জায়গায়), কবরসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অথবা কবরের দিকে মুখ করে বা কবরকে সামনে করে জানাযা পড়া বৈধ ও শুদ্ধ নয়। আনাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ কবরসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।' *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৩৬, ইবনে আবী শাইবাহ ২/১৮৫)*

আবূ মারষাদ গানাবী বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা কবরের উপরে বসো না এবং তার দিকে সম্মুখ করে নামায পড়ো না।" *(মুসলিম ১৬১৩, তিরমিযী ৯৭১ক, নাসাঈ ৭৫২প্রমুখ)*

অবশ্য এ ক্ষেত্রে যে জানাযা পড়ে নি, তার জন্য কবরস্থ মাইয়্যেতের কবরের উপর জানাযা পড়ার কথা ব্যতিক্রম।

পায়ের জুতা অপবিত্র থাকলে তা খুলে মুসাল্লা থেকে দূরে রাখতে হবে অথবা মাটিতে মেজে-ঘষে তা পবিত্র করে নিতে হবে। পবিত্র সত্ত্বেও জুতা খুলে রেখে নামায পড়তে চাইলে দু পায়ের ফাঁকে রেখে নিতে হবে। ডাইনে অথবা বামে রাখা চলবে না। কারণ, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেউ জুতা খুলে রেখে নামায পড়তে চায়, তখন সে যেন জুতা দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেয়। বরং সে যেন তা তার দু' পায়ের ফাঁকে রেখে নেয় অথবা পায়ে রেখেই নামায পড়ে।" *(আবূ দাউদ ৫৫৯, সহীহ আবূ দাউদ ৬১০নং)*

এ ছাড়া জানাযার নামাযের সময় স্পষ্ট অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকা সত্ত্বেও জুতা খুলে তার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া বিদআত। *(আহকামুল জানাইয অবিদাউহা নং ৭৪)*

মাইয়্যেত পুরুষ হলে ইমাম তার মাথার সোজা এবং মহিলা হলে তার মাঝামাঝি খাড়া হবেন। আবূ গালেব খাইয়াত্ব বলেন, 'একদা আনাস বিন মালেক ﷺ এক পুরুষ মাইয়্যেতের জানাযা পড়লেন। আমি সে জামাআতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তিনি লাশের মাথার নিকট খাড়া হলেন। অতঃপর তা তোলা হলে এক কুরাইশ বা আনসারদের জানাযা পেশ করা হল এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বলা হল, 'হে আবু হামযা! এটা হল অমুকের কন্যা অমুকের জানাযা; এরও নামায পড়ে দিন। সুতরাং তিনি লাশের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে জানাযা পড়লেন। আমাদের উক্ত জামাআতে আলা' বিন যিয়াদ আদাবীও

উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষ ও মহিলার জানাযায় পৃথকরূপে খাড়া হওয়া দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবূ হামযা! আল্লাহর রসূল ﷺ কি পুরুষের জানাযায় আপনি যে জায়গায় দাঁড়ালেন ঐ জায়গাতেই এবং মহিলার জানাযায় যেভাবে দাঁড়ালেন ঐভাবেই দাঁড়াতেন?' উত্তরে আনাস ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর আলা' আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা একথা মনে রেখো।' *(আবূ দাউদ ২৭৭৯ক, তিরমিযী ৯৫৫কে, ইবনে মাজাহ ১৮৮৩ক, আহমাদ ১২৬৪০ক)*

সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ বলেন, 'সন্তান প্রসবের পর উম্মে কা'ব মারা গেলে মহানবী ﷺ তার জানাযা পড়লেন। তাঁর পিছনে আমিও জানাযা পড়লাম। দেখলাম, আল্লাহর রসূল ﷺ তার জানাযা পড়ার উদ্দেশ্যে তার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ালেন।' *(বুখারী ৩২০ক, মুসলিম ১৬০২ক, প্রমুখ)*

পুরুষ ও মহিলার জানাযা এক সাথে হলে পুরুষের খেয়াল রেখে মাথার দিকে ইমাম দাঁড়াবেন। অবশ্য মহিলার লাশ একটু ডাইনে বাড়িয়ে পুরুষের মাথা তার দেহের মাঝামাঝি করেও দাঁড়াতে পারেন। এ ব্যাপারে উভয় আমল সলফ কর্তৃক বর্ণিত। *(ইবনে আবী শাইবাহ ১১৫৫- ১১৫৬০নং দ্রষ্টব্য।)*

জানাযার নামায পড়ার সময় লাশের মাথা ইমামের ডাইনে (উত্তর দিকে) নাকি বামে (দক্ষিণ দিকে) হবে তার কোন নির্দেশ সুন্নাহতে নেই। এ জন্যই জানাযার ইমামের উচিত, কখনো কখনো লাশের মাথার দিক নিজের বাম দিকে রাখা। যাতে সাধারণ লোক বুঝতে পারে যে, ইমামের ডান দিকে মাথা রাখা ওয়াজেব নয়। কারণ, লোকেরা মনে করে যে, ইমামের ডান দিকে (উত্তর দিকেই) লাশের মাথা হওয়া জরুরী; অথচ এর কোন ভিত্তি নেই।

তবে ডান (উত্তর) দিকে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, কবরে এভাবেই রাখা হয়। আর দাফনের পরে কেউ জানাযা পড়লে লাশের মাথা তার ডাইনে পড়ে। *(দেখুন, সাবউনা সুআলান ফী আহকামিল জানাইয ১৭ পৃঃ)*

বড় সম্মেলন বা ইজতিমায় জানাযা হাজির হলে এবং মাইয়্যেত পুরুষ, শিশু না মহিলা তা সকল উপস্থিত ব্যক্তির জানা অসম্ভব হলে, তা সাধারণভাবে ঘোষণা করা বৈধ হবে। তবে অজান্তে যদি মহিলার ক্ষেত্রে দুআর শব্দে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়, তাহলে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, মহিলা জানা সত্ত্বেও তার জন্য দুআর শব্দে পুং-লিঙ্গ ব্যবহার করা যায়; যখন উদ্দেশ্য হয় 'মাইয়্যেত।'

যেহেতু আরবী ভাষায় 'মাইয়্যেত' শব্দটি উভয় লিঙ্গ। *(ঐ ১১ পৃঃ)* অবশ্য না জেনে সকলের ক্ষেত্রে "আল্লাহুম্মাগফির লিহায়্যিনা---" দুআ ব্যবহার করা যায়।

জানাযা মাটিতে থাকা অবস্থায় লাশের কাছে সর্বদা একজনকে লাশ আগলে থাকতে হবে এমন ধারণা যথাযথ নয়। যেমন জানাযার নামাযের পূর্বে লাশের বাঁধন খুলে দেওয়াও বিধেয় নয়।

জানাযার নামায শুরু করার পূর্বে ইমামের নসীহত করার প্রসঙ্গে কোন দলীল নেই। এই সময় নসীহত বিধেয় নয়। কবর ইত্যাদি প্রস্তুত হতে দেরী হলে সেই অবসরে নসীহত করা যায়। যেমন একদা নবী ﷺ সাহাবাদের এক ব্যক্তির জানাযায় বের হয়ে কবর খুঁড়তে দেরী হচ্ছিল বলে সেখানে বসে গেলেন। তাঁর আশে-পাশে সকল সাহাবাগণও নিশ্চুপ, ধীর ও শান্তভাবে বসে গেলেন। তখন মহানবী ﷺ-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল যদ্দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্‌ চাও।" তিনি এ কথা দুই কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফিরিশ্তা আসেন; যাদের চেহারা যেন সূর্যস্বরূপ। তাদের সাথে বেহেশ্তের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং বেহেশ্তের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টি-সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন ঃ 'হে পবিত্র রূহ (আত্মা)! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে।'

তখন তার রূহ সেই রকম (সহজে) বের হয়ে আসে; যে রকম (সহজে) মশক হতে পানি বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মাওত তা গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না বরং ঐ সকল অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তা এসে তা গ্রহণ করেন এবং ঐ কাফন ও ঐ খোশবুতে রাখেন। তখন তা হতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মিশ্‌কের খোশবু বের হতে থাকে।

তা নিয়ে ফিরিশ্তাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তাঁরা ফিরিশ্তাদের মধ্যে কোন ফিরিশ্তাদলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই পবিত্র রূহ (আত্মা) কার?' তখন তাঁরা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তম উপাধি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, 'এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ।'

যতক্ষণ তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে।) অতঃপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাঁদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পশ্চাদ্গামী হন তার উপরের আসমান পর্যন্ত। এভাবে তাঁরা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীন'-এ লিখ এবং তাকে (তার কবরে) জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতঃপর জমিন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে।)" সুতরাং তার রূহ্ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার রব কে?' তখন উত্তরে সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কি?' তখন সে বলে, 'আমার দ্বীন হল ইসলাম।' আবার তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' সে উত্তরে বলে, 'তিনি হলেন আল্লাহর রসূল।' পুনরায় তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি তা কি করে জানতে পারলে?' সে বলে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছিলাম।' তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশ্তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশ্তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও!"

তখন তার প্রতি বেহেশ্তের সুখ-শান্তি ও বেহেশ্তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, 'তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল।' তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখবার মত চেহারা! তা যেন কল্যাণের বার্তা বহন করে।' তখন সে বলে, 'আমি তোমার নেক আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন এ বলে, 'হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি। (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও বেহেশ্তী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)।'

কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তার নিকট আসমান হতে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন। যাঁদের সাথে শক্ত চট থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল-মাওত আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসেন। অতঃপর বলেন, 'হে খবীস রূহ্ (আত্মা)! বের হয়ে আয় আল্লাহর রোষের দিকে।'

এ সময় রূহ্ ভয়ে তার শরীরে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মাওত তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজে পশম হতে টেনে বের করা হয়। (আর তাতে পশম লেগে থাকে।) তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্ত কালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং তা অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তাগণ তাড়াতাড়ি সেই আত্মাকে দুর্গন্ধময় চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশী। তা নিয়ে তাঁরা উঠতে থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁরা তা নিয়ে ফিরিশ্তাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই খবীস রূহ্ কার?' তখন তাঁরা তাকে দুনিয়াতে যে সকল মন্দ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ নামটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের।'

এইভাবে তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় নবী ﷺ এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন,

* :N#46 M$3 '(L (B2' K3 I 6 2 5 & <&! (I 4J &)GH 4G)( ) +F

XW P$& U VP > 'GH S T& B E0 - $P& R:4Q3? O3P&

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। *(সূরা আ'রাফ ৪০ আয়াত)*

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার ঠিকানা 'সিজ্জীন'-এ লিখ; জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং তার রূহকে জমিনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় মহানবী ﷺ এর সমর্থনে এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ﴾

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে সে যেন আকাশ হতে পড়েছে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করেছে।

সুতরাং তার রূহ্ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার পরওয়ারদেগার কে?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কি?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?' সে বলে, 'হায়, হায় আমি তাও তো জানি না।'

এ সময় আকাশের দিক হতে আকাশ বাণী হয় (এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন), 'সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়; যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট

নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, 'তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর! এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত।' তখন সে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা; যা মন্দ সংবাদ বহন করে!' সে বলে, 'আমি তোমার সেই বদ আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন সে বলে, 'আল্লাহ, কিয়ামত কায়েম করো না। (নচেৎ তখন আমার উপায় থাকবে না।) *(আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবূদাউদ ৪৭৫৩নং)*

অনুরূপভাবে আরো একবার তিনি কোন মাইয়্যেত দাফন করার সময় বাকী'তে বসে উপবিষ্ট সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে হাদীস বর্ণনা করে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই; যার জান্নাত অথবা জাহান্নামের ঠিকানা নির্দিষ্টভাবে লিখিত হয়নি---।" *(বুখারী ৬৯৯৭, মুসলিম ৪৭৮৬ক)*

কিন্তু এই সময় তিনি কখনো দাঁড়িয়ে খুতবাহ বা বক্তৃতা দেননি। বরং স্বাভাবিকভাবে বৈঠকে যেমন কথা বলা হয় তেমনি বলেছিলেন। পরন্তু তিনি সর্বদা এরূপ করতেন না। বরং দাফন-কার্যে বিলম্ব থাকলে বসে কথা বলতেন।

অতএব যদি কোন মাইয়্যেতের লাশ কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে দাফন-কার্যে দেরী হলে ইমাম বা কোন আলেম ব্যক্তি নবী ﷺ-এর অনুরূপ কথা কথাচ্ছলে বলতে পারেন। এমন বলা সুন্নত। দন্ডায়মান হয়ে বক্তৃতাচ্ছলে নয়। কারণ এখানে খুতবাহ সুন্নত বা নবী ﷺ-এর তরীকা নয়। *(দেখুন, সাবউনা সুআলান ফী আহকামিল জানাইয ২৬পৃঃ)*

তদনুরূপ উক্ত সময়ে মাইয়্যেতের অভিভাবক, ওয়ারেস বা কোন প্রতিনিধি অথবা ইমামের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মাইয়্যেতকে 'খালাস' দিতে (ক্ষমা করতে) অনুরোধ জানানো বিধেয় নয়। বরং একাজ বিদআত। সুতরাং সকলের উদ্দেশ্যে একথা বলা যাবে না যে, 'আপনারা সকলে ওকে খালাস দিন। ওকে মাফ করে দিন---' ইত্যাদি। কারণ, তার সাথে যদি উপস্থিত জনসাধারণের কারো লেন-দেন না থেকে থাকে, তাহলে তো তাদের কারো মনে কিছু থাকার কথা নয়। পক্ষান্তরে যার সাথে লেন-দেন ছিল তার ওয়াজেব হক যদি জীবিতকালে আদায় করে থাকে, তাহলে তারও মনে কোন দাবী থাকার কথা নয়। আর যদি জীবিতকালে তার ওয়াজেব হক আদায় না করে থাকে, তাহলে সে মাইয়্যেতকে করতেও পারে। আবার মুখে মাফ করে মনে মনে তার দাবীও

রাখতে পারে অথবা একেবারেই মাফ নাও করতে পারে। পরন্তু নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি লোকেদের মাল (ঋণ) নিয়ে আদায় করার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ তার তরফ থেকে আদায় করে দেন। আর যে ব্যক্তি তা নিয়ে আত্মসাৎ করার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন।" *(বুখারী ২২১২ক, ইবনে মাজাহ ২৮০২ক, সাবউনা সুআলান ৩৫ পৃঃ)*

তাছাড়া আর্থিক অধিকার হলে ওয়ারেসদের জন্য তা আদায় করা ওয়াজেব। যেমন তার ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করাও জরুরী। যদি তার অর্থ বা ওয়ারেস কেউ না থাকে, তবে জীবিতকালে তার আদায়ের নিয়ত থেকে থাকলে আল্লাহ নিজের তরফ থেকে তা আদায় মাফ করার ওয়াদা করেছেন।

সকলের খেয়াল রাখা উচিত, যেন লোকে লাশের উপর ভিঁড় না জমায়। বিশেষ করে মহিলার লাশ হলে তার বিশেষ মর্যাদার খেয়াল রাখা অবশ্য কর্তব্য।

পক্ষান্তরে ভয়ে বা অন্য কারণে লাশের কাছ ঘেঁসতে বা সামনে পড়তে দ্বিধা করা এবং কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করা যথার্থ নয়। বরং তা এক প্রকার কুসংস্কার ও মেয়েলী ধারণা মাত্র।

দাফন করার পূর্বে জানাযা নিয়ে কোন ওলীর কবর, আযার বা আস্তানা দর্শন বা তওয়াফ করা বিদআত ও শির্ক। *(আহকামুল জানাইয ২০৫পৃঃ)*

জানাযার নামাযের পদ্ধতি

জানাযার নামায ৪, ৫, ৬, ৭, ও ৯ তকবীরে পড়া বিধেয়। এর প্রত্যেকটিই নবী ﷺ হতে সহীহ-সূত্রে প্রমাণিত আছে। সুতরাং যে কোন একটি হাদীসের উপর আমল করলে সুন্নত পালন হয়ে যায়। তবে সব রকম তকবীরের উপর কখনো কখনো আমল করাই উচিত। যাতে সমস্ত সহীহ হাদীসের উপর আমল বজায় থাকে। আর যদি এক ধরনের আমল রাখতেই হয়, তাহলে চার তকবীরের উপর আমল রাখা যায়। কারণ, চার তকবীরে জানাযা বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবার চেয়ে বেশী। *(দেখুন, আহকামুল জানাইয ১১১ পৃঃ)*

এবারে জানাযার নামাযের পদ্ধতি নিম্নরূপঃ-

নামাযী সর্ব প্রথম প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে জানাযার নামাযের নিয়ত

করবে। (প্রকাশ যে, বাঁধা-গড়া নিয়ত পড়া বা নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বিদআত।)

অতঃপর অন্যান্য নামাযের মতই তার উভয় হাত কানের উপরিভাগ অথবা কাঁধ বরাবর তুলবে। আর এর সাথে 'আল্লা-হু আকবার' বলে তকবীর দেবে। অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করবে। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক জানাযার নামায পড়াকালে তকবীর দিলেন এবং প্রথম তকবীরের সময় তাঁর উভয় হাতকে তুললেন। অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন।' *(তিরমিযী ৯৯৭নং, সহীহ তিরমিযী ৮৫৯নং)*

অতঃপর 'আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ' পড়ে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। অতঃপর 'বিসমিল্লাহ' বলে একটি (ছোট) সূরা পাঠ করবে।

তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আউফ বলেন, আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-এর পশ্চাতে এক জানাযার নামায পড়লাম। তিনি উচ্চস্বরে আমাদেরকে শুনিয়ে সূরা ফাতেহা ও একটি অন্য সূরা পাঠ করলেন। অতঃপর নামায শেষ করলে আমি তাঁর হাতে ধরে (উচ্চস্বরে পড়ার কারণ) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি উচ্চস্বরে এই জন্যই পড়লাম; যাতে তোমরা জানতে পার যে, উক্ত সূরা পাঠ সুন্নাহ (নবী ﷺ-এর তরীকা) ও হক (সত্য)।' *(বুখারী ১২৪৯ক, আবূদাঊদ ২৭৮৩ক, তিরমিযী ৯৪৭,৯৪৮ক, নাসাঈ ১৯৬১ক, ইবনুল জারূদ, মুনতাকা ২৬৪নং)*

সুতরাং উভয় সূরা চুপে-চুপে পড়াই সুন্নাহ। তাই আবূ উমামাহ সাহ্‌লও বলেন, 'জানাযার নামাযে সুন্নাহ হল, প্রথম তকবীরের পর নিশ্চুপে সূরা ফাতেহা পাঠ করা। অতঃপর তিন তকবীর দেওয়া এবং শেষে সালাম ফেরা।' *(নাসাঈ ১৯৬৩ক)*

অবশ্য শিক্ষাদান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে পড়া দোষাবহ নয়। যেমন ইবনে আব্বাস ﷺ পড়েছিলেন। যেমন নবী ﷺ জানাযার দুআ উচ্চস্বরে পড়েছেন। যা শুনে সাহাবাগণ মুখস্থ করেছেন।

উক্ত ক্বিরাআতে সংক্ষিপ্ত সূরা পড়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, জানাযা সমস্ত কাজই তড়িঘড়ির উপর সমাধা করা কর্তব্য। আর এ জন্যই এ নামাযে ইস্তিফতাহ্‌র দুআ পাঠ বিধেয় নয়। *(সাবঊনা সুআলান ১২পৃঃ)*

ছোট একটি সূরা পাঠ শেষ হলে নামাযী দ্বিতীয় তকবীর দেবে। এই তকবীর

এবং এর পরের তকবীরগুলোতে হাত তোলার প্রসঙ্গে নবী ﷺ হতে কিছু প্রমাণিত নেই। আর প্রথম তকবীর ছাড়া অন্যান্য তকবীরের সময় তিনি হাত তুলতেন না বলে যে হাদীস আছে, তা শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস ও আনাস ﷺ হতে বর্ণিত যে, তাঁরা সকল তকবীরে হাত তুলতেন। *(নাইলুল আউতার ৪/৬২)* অতএব সাহাবাদের এই আমলকে সুন্নাহ ধরে নিয়ে প্রত্যেক তকবীরের সময় হাত তোলা উত্তম বলা যায়। কারণ, তাঁরা নবী ﷺ কে অনুরূপ হাত তুলতে দেখেছেন বলেই তাঁদের আমল ঐরূপ ছিল। নচেৎ উক্ত আমল তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদও বলা যায় না। তবে যদি এ কথা কেউ না মানেন, তাহলে হাত না তোলাতেও কোন দোষ নেই।

অতঃপর নামাযী বুকের উপর হাত রেখে নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। সেই ইব্রাহীমী দরূদ পাঠ করবে যা নামাযের তাশাহ্হুদে পাঠ করা হয়ে থাকে। *(দেখুন, বাইহাকী ৪/৩৯, ইবনুল জারূদ ২৬৫ নং, প্রমুখ)*

অতঃপর তৃতীয় তকবীর বলে (দুই হাত না তুলে অথবা তুলে পুনরায় হাত বুকে রেখে) মাইয়্যেতের জন্য বিশুদ্ধচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে দুআ করবে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা মাইয়্যেতের জানাযা পড়বে তখন তার জন্য বিশুদ্ধচিত্তে দুআ করবে।" *(আবূ দাঊদ ২৭৮৪ক, ইবনে মাজাহ ১৪৮৬ক)*

সেই দুআ পাঠ করবে যা মহানবী ﷺ হতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। যেমনঃ-

;! 6 <= 6>+ ?@A 53 3 *+ #$&

B(CD ,& $E 5 " $E5 F GHI D ,& E J " $E5 !F #$&

'$?M '5* K $ 8! K #$&

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা অস্বাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনষা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না বা'দাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি

জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দিবে তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/২৫২ আহমাদ ২/৩৬৮, তিরমিযী ৯৪৫ক, নাসাঈ ১৯৬০ক, আহমাদ ১৬৮৮৫ক, আবু দাউদ ২৭৮৬ক, ইবনে মাজাহ ১৪৮৬ক, মিশকাত ১৬৭৫নং)* কোন কোন বর্ণনায় দুআর শেষে "অলা তাফতিন্না"র পরিবর্তে "অলা তুযিল্লানা বা'দাহ" (অর্থাৎ, ওরপর আমাদেরকে ভ্রষ্ট করো না।) বর্ণিত আছে।

প্রকাশ যে, এই দুআটি সকল শ্রেণীর মুর্দার জন্য পড়া চলে।

২- $N & ?$ ON B $N P$G ! $E- $ - E - $( ) $E *+ #$&

FN $ 1/ $; , 2$ (CUV F E2 W6 X& Q(1$&R+

E8 YF3 8 Y E&@ F3 H@ L) WF3 Z) W$E?1! [?

') " T \- 62 T \- F $\-!]"^ $& W

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগ্‌সিলহু বিলমা-ই অষ্‌ষালজি অল-বারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়্যা কামা য়্যুনাক্কাষ ষাউবুল আবয়্যায্যু মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইযহু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অ আযা-বিন্নার।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে এমন পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের আযাব থেকে রেহাই দাও।

বর্ণনাকারী সাহাবী আউফ বিন মালেক বলেন, (আল্লাহর রসূল ﷺ-কে যখন এই দুআ বলতে শুনলাম) তখন আমি এই কামনা করলাম যে, যদি আমি এই

মাইয়্যেত হতাম! *(মুসলিম ১৬০০ক, তিরমিযী ৯৪৬ক, নাসাঈ ১৯৫৭ক, ইবনে মাজাহ ১৪৮৯ক, আহমাদ ২২৮৫০ক)*

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দুআটি পুরুষ মাইয়্যেতের জন্য ব্যবহৃত। কারণ, নবী ﷺ পুরুষের জন্যই পড়েছিলেন। মহিলার জন্যও পড়া বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে যদি তার স্বামী বেদীন হয় তবেই পূর্ণ দুআ বলা যাবে। নচেৎ "অযাউজান খাইরাম মিন যাওজিহ" (অর্থাৎ ওর পার্থিব জুড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ি দান কর) বাক্যটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে। কারণ, স্বামী নেক হলে এবং উভয়ে জান্নাতে গেলে স্ত্রী উক্ত স্বামীরই অধিকারে থাকবে। *(আল-বিজাযাহ)*

স্বামী নেক হলে উক্ত দুআয় উক্ত বাক্য বলার সময় এই অর্থ নিলেও পূর্ণ দুআ পড়া যায়; অর্থাৎ, "বর্তমানে ওর স্বামী যে গুণ ও চরিত্রে আছে বা ছিল আখেরাতে তার চাইতে আরো উৎকৃষ্ট গুণ ও চরিত্রবান করে দিও।" *(দেখুন, আশ্‌শারহুল মুমতে' ইবনে উষাইমীন ৫/৪১২)*

৩- T \- 62] 5 E2 _) 8 ‘ 6 a 5' BH F1BH B #$&

'$ " $ *< !a "$( ) E *+ 0 Q ‘@ !) "

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা অহাবলি জিওয়ারিক, ফাক্বিহী ফিতনাতাল ক্বাবরি অ আযা-বান্নার, অ আন্তা আহলুল অফা-ই অলহাক্ব্, ফাগফির লাহু অরহামহু ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আমানতে। অতএব ওকে তুমি কবর ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি বিশ্বাস ও ন্যায়ের পাত্র। সুতরাং ওকে তুমি মাফ করে দাও এবং ওর প্রতি দয়া কর। নিঃসন্দেহে তুমিই মহাক্ষমাশীল অতি দয়াবান। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/২৫১, আবু দাউদ ৩/ ২১১, আবূ দাউদ ৩২০৩ক, ইবনে মাজাহ ১৪৯৯ক, ইবনে হিব্বান ৫৭৮-নং, আহমাদ ৩/৪৭১, সহীহ আবূ দাউদ ২৭৪২নং)*

৪- E1\- F- c + ! a 5( ) d e 5 a 5!$1 _$6 #$&

'E- Y ^5 fR$B B E R WP R $ B B

উচ্চারণঃ- "আল্লা-হুম্মা আবদুকা অবনু আমাতিকাহতা-জা ইলা রাহমাতিক, অআন্তা গানিইয়্যুন আন আযা-বিহ, ইন কা-না মুহসিনান ফাযিদ

ফী হাসানা-তিহ, অইন কা-না মুসীআন ফাতাজা-অয আন্হ।”

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী এবং তুমি ওকে আযাব দেওয়া থেকে বেপরোয়া। যদি ও নেক হয় তবে ওর নেকী আরো বৃদ্ধি কর। আর যদি গোনাহগার হয় তবে ওকে ক্ষমা কর। *(হাকেম ১/৩৫৯, ত্বাবারনীর কাবীর)*

আফযল হল, প্রত্যেক জানাযায় একই ধরনের দুআ না পড়া। বরং এক এক জানাযায় এক এক দুআ বদ্‌লে বদ্‌লে পড়া। কারণ, নবী ﷺ অনুরূপ করেছেন। এতে সমস্ত হাদীসের উপর আমল হবে।

মাইয়্যেত শিশু হলে প্রথমোক্ত দুআ করবে। কারণ, তা সকলের জন্য সাধারণ। তবে কিছু সলফে সালেহ শিশুর জানাযায় নিম্নের দুআ পাঠ করতেনঃ-

’ 8!" *& " g $&M8 #$&

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারাত্বাঁউ অ সালাফাঁউ অ আজরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে আমাদের জন্য অগ্রগামী (জান্নাতে পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ ব্যবস্থাকারী) এবং সওয়াব বানাও। *(শারহুস সুন্নাহ ৫/৩৫৭, বাইহাকী, বুখারী বিনা সনদে ফাতহুল বারী ৩/২৪২, নাইলুল আউতার ৪/৬৪)*

অবশ্য শিশুর জন্য দুআ করার সময় তার পিতা-মাতার জন্যও ক্ষমা ও রহমতের দুআ করা বিধেয়। *(সহীহ আবূ দাউদ ২৭২৩নং)*

মাইয়্যেত মহিলা হলে দুআর শব্দগুলিতে ‘হু’ সর্বনামের স্থলে ‘হা’ ‘আবদ্‌’ এর স্থলে ‘আমাহ্‌’ ‘বিন’ এর স্থলে ‘বিনত’, ‘ফুলান’এর স্থলে ‘ফুলানাহ্‌’, বাবহার করতে হবে। একাধিক মাইয়্যেত হলে ঐ শব্দগুলির বহুবচন ব্যবহারই ভাষার দাবী। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দুআটির প্রয়োগ যথাবিহিত। *(আলমুমতে’, ইবনে উষাইমীন ৫/৪১৪, আল বিজাযাহ ৯২পৃঃ)*

দুআ শেষ হলে (হাত তুলে) চতুর্থ তকবীর দিয়ে বুকে হাত রাখবে। অতঃপর নীরব থেকে একটু অপেক্ষা করবে। (অবশ্য এ তকবীরের পরেও দুআ পড়ার কথা প্রমাণিত।) *(দেখুন, বাইহাকী ৪/৩৫, হাকেম ১/৩৬০, আহমাদ ৪/৩৮৩, ইবনে মাজাহ ১৫০৩নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১২২০নং)*

অতঃপর অন্যান্য নামাযে সালাম ফেরার মত ডাইনে ও বামে উভয় দিকে

সালাম ফিরবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'তিনটি কাজ আল্লাহর রসূল ﷺ করতেন। কিন্তু লোকেরা তা বর্জন করেছে; এর মধ্যে একটি হল (অন্যান্য) নামাযের মত জানাযার নামাযে সালাম ফেরা।' *(বাইহাক্বী ৪/৪৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৩৪)*

অবশ্য এক দিকে (কেবল ডাইনে) সালাম ফেরাও যথেষ্ট। কারণ, আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক জানাযার নামায পড়লেন। তিনি তাতে চার তকবীর দিলেন এবং শেষে একটি মাত্র সালাম ফিরলেন।" *(দেখুন, দারাকুত্নী ১৯১নং, হাকেম ১/৩৬০, বাইহাকী ৪/৪৩)*

মুক্তাদী হলে এবং ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পড়লে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আর অন্য একটি সূরা পাঠ না করে ইমামের কিরাআত শুনবে।

পাঁচ বা তার অধিক তকবীর দিয়ে জানাযা পড়লে উল্লিখিত দুআগুলির মধ্য হতে চতুর্থ ও তার পরের তকবীরগুলির পরে এক একটি করে পড়া যায়। *(সাবউনা সুআলান ৭পৃঃ)*

জানাযার নামাযে কেউ মসবূক হলে (অর্থাৎ, দেরীতে পৌঁছে ২/ ১ তকবীর ছুটে গেলে) ইমামের সাথে জামাআতে শামিল হবে। যতটা পাবে ততটা পড়ে নিয়ে বাকী কাযা করতে হবে। কারণ, মহানবী ﷺ-এর সাধারণ হাদীস এই যে, "তোমরা জামাআতের সাথে যেটুকু নামায পাও তা পড়ে নাও এবং যতটুকু ছুটে যায় ততটুকু পুরো করে নাও।" *(বুখারী ৬৩৫নং, মুসলিম ৬০২নং)* সুতরাং ইমাম সালাম ফিরে দিলে এবং লাশ তোলা না হলে বাকী তকবীর পুরো করে নেবে। নচেৎ লাশ তুলে নেওয়ার আশঙ্কা থাকলে পুরো করতেও পারে নতুবা ইমামের সাথেই সালাম ফিরতে পারে। *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪৬৫, সাবউনা সুআলান ১৩পৃঃ)*

জানাযার নামায শুরু হয়ে যাওয়ার পর যদি ওযু করতে যাওয়া যায়, তাহলে নামায ছুটে যাবে। তবুও এ ক্ষেত্রে ওযু না করে তায়াম্মু করে নামাযে শামিল হওয়ার অনুমতি যথার্থ নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়েছেন কেবল পানি না পাওয়া বা ব্যবহারে সমর্থ না হওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি বলেন,

﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾

অর্থাৎ, পানি না পেলে তায়াম্মুম কর। *(সূরা নিসা ৪৩ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্র অর্জনের সামগ্রী করা হয়েছে যখন আমরা পানি পাব না।” *(মুসলিম ৫২২নং)*

অতএব উক্ত ক্ষেত্রে পানি মজুদ থাকার কারণে জামাআত ছুটার ভয়ে তায়াম্মুম বৈধ ও শুদ্ধ নয়। আর ওয়াজেব হল সাধারণ উক্তির উপর আমল করা। অবশ্য খাস বা নির্দিষ্ট হওয়ার দলীল পাওয়া গেলে সে কথা ভিন্ন। পরন্তু এখানে খাস করার কোন নির্ভরযোগ্য দলীল নেই। *(ফতহুল বারীরর টীকা ৩/২২৮)*

নামায শেষ হওয়ার পর যদি কোন জামাআত (একাধিক লোক) আসে তবে দাফন না হয়ে থাকলে তারাও জামাআত করে লাশকে সামনে রেখে অনুরূপ জানাযা পড়বে। দাফন হয়ে গিয়ে থাকলে কবরকে সামনে করে জানাযা পড়বে। কারণ নবী ﷺ হতে কবরের উপর জানাযার নামায পড়া প্রমাণিত। *(সাবউনা সুআলান ১৯পৃঃ)*

জানাযার নামাযই মাইয়্যেতের জন্য দুআ। সুতরাং এরপর পুনরায় হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত বিদআত।

এই স্থানে মড়া-বাড়ির তরফ হতে সাধারণভাবে গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজনকে (ওলীমার মত) দাওয়াত দেওয়া এবং আত্মীয়দের সেই দাওয়াত গ্রহণ করা বিধেয় নয়। বরং তা বড় বিদআত। *(মু'জামুল বিদা ১৬৩পৃঃ)* বিধেয় হল কোন আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে মড়া-বাড়ির লোকেদের জন্যই পেট ভরার মত খানা-পিনা প্রস্তুত করে পাঠানো।

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বলেন, জা'ফর ؓ শহীদ হওয়ার পর যখন তাঁর সে খবর পৌঁছল, তখন নবী ﷺ বললেন, “জা'ফরের পরিজনের জন্য তোমরা খানা প্রস্তুত কর। কারণ, ওদের নিকট এমন খবর পৌঁছেছে; যা ওদেরকে বিভোর করে রাখবে।” *(আবু দাউদ ৩১৩২নং, তিরমিযী ৯৯৮নং, ইবনে মাজাহ ১৬১০নংপ্রমুখ, সহীহ আবু দাউদ ১৫৮৬নং)*

সাহাবী জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী বলেন, 'দাফনের পর মড়া বাড়িতে খানা ও ভোজের আয়োজনকে এবং লোকদের জমায়েতকে আমরা জাহেলিয়াতের মাতম হিসাবে গণ্য করতাম। (যা ইসলামে হারাম।) *(আহমাদ ৬৯০৫নং, ইবনে মাজাহ ১৬১২নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৮নং)*

কিন্তু যে সমাজে সে সহানুভূতি ও সহায়তা নেই, সেখানে কি হবে? বদনাম নেওয়া ভালো হবে, নাকি জাহেলিয়াতি কর্ম?

পক্ষান্তরে খাবারের ব্যবস্থা না হলে নিজেদের তথা দূরবর্তী মেহেমানদের (যাদের সেদিন বাড়ি ফিরা অসম্ভব তাদের) জন্য তো নাচারে ডালভাত করতেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সুনামের লোভে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাছ-মাংসের ভোজবাজিতে আত্নীয় স্বজন, জানাযার কর্মী (?!) মাদ্রাসার স্টাফ ও ছাত্রবৃন্দ (!) পাড়া-প্রতিবেশী এবং কখনো বা গোটা গ্রামকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয় ও তা পরমানন্দে খাওয়াও হয়, তথা কিছুতে একটু লবণ কম হলে দুর্নাম করতেও কসুর হয় না। এমন ভোজবাজি যে জাহেলিয়াত থেকেও নিকৃষ্টতর তাতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে কি?

দাফন

কাফের হলেও তার মৃতদেহ দাফন করা ওয়াজেব। আবূ তালেব মারা গেলে নবী ﷺ আলী ؓ-কে বললেন, "তোমার বৃদ্ধ চাচা তো মারা গেল। এখন যাও ওকে কবরস্থ করে এস---।" *(আহমাদ ৮০৭নং, আবূ দাউদ ৩২১৪নং, নাসাঈ ২০০৫নং, প্রমুখ, সহীহ আবূ দাউদ ২৭৫৩নং)*

তা ছাড়া তিনি বদর-যুদ্ধের দিন কুরাইশদের মৃতদেহসমূহকে বদরের এক কুয়ায় ফেলতে সাহাবাগণকে আদেশ করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা উক্ত কাফেরদের লাশসমূহকে কুয়ায় ফেলেছিলেন এবং উমাইয়া বিন খালাফের লাশকে মাটি ও পাথর দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। *(দেখুন, বুখারী ৩৯৭৬, মুসলিম ২৮৭৫নং, আহমাদ ৩/ ১০৪, ৪/ ১২৯ প্রমুখ)*

তবে কাফের (অনুরূপ মুশরিক, মুনাফিক এবং মতান্তরে বেনামাযী)কে মুসলিমদের সাধারণ কবরগাহে দাফন করা যাবে না। আর কোন মুসলিমকেও কাফেরদের সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা যাবে না। এই আমলই ছিল মহানবী ﷺ এর যুগে।) *(দেখুন, আবূ দাউদ ৩২৩০, নাসাঈ ২০৪৭, ইবনে মাজাহ ১৫৬৮-নং প্রমুখ সহীহ আবূ দাউদ ২৭৬৭নং)*

কোন মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অথবা কোন বুযুর্গের বা আহলে বাইতের কবরের পাশে কবর দেওয়ার জন্য দূর থেকে লাশ বহন করা বিদআত। *(আহকামুল জানাইয ২৪৮-পৃঃ)*

সুতরাং মাইয়্যেত যত বড়ই বুযুর্গ হোক, তাকে সাধারণ ও স্থানীয়

কবরস্থানেই দাফন করা সুন্নত। কারণ, মহানবী ﷺ-এর যুগে সকল মাইয়্যেতকেই তিনি বাকী'র গোরস্থানে দাফন করতেন। আর একথা কোন সলফ কর্তৃক বর্ণিত হয় নি যে, কারো লাশ করস্থ ছাড়া অন্য কোথাও দাফন করা হয়েছে। অবশ্য মহানবী ﷺ যে তাঁর হুজরায় সমাধিস্থ, সে কথা প্রসিদ্ধ। যেহেতু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু অসসালামগণের যে স্থানেই ইন্তিকাল হয় সে স্থলেই তাঁদের কবর হয়।

তদনুরূপ শহীদদের কবরও জিহাদের ময়দানে তাঁদের নিহত হওয়ার স্থলেই হয়ে থাকে এবং সাধারণ কবরস্থানে তাঁর লাশ বহন করে এনে দাফন করা হয় না। *(দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৯৭-৩৯৮)*

কোন ঘরের ভিতর কবর নেওয়া বা দেওয়া মোটেই বৈধ নয়। কারণ, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহসমূহকে কবর বানিয়ে নিও না।" *(মুসলিম ৭৮০, তিরমিযী ২৮৭৭নংপ্রমুখ)*

অনুরূপভাবে বৈধ নয় কোন মসজিদের সীমার ভিতরে মৃত দাফন করা। যেহেতু যে মসজিদে কবর থাকে, তাতে নামাযই শুদ্ধ ও বৈধ হয় না। *(দেখুন, তাহযীরুস সাজেদ, আল্লামা আলবানী)* প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কবরস্থান, প্রস্রাব-পায়খানা ও গোসল করার স্থান ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জায়গাই মসজিদ।" (তাতে নামায পড়া চলে।) *(আবূ দাঊদ ৪৯২, তিরমিযী ৩১৭, ইবনে মাজাহ ৭৪৫ প্রমুখ)*

এ ছাড়া তাঁর ব্যাপক নির্দেশ রয়েছে যে, "সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিও না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুসলিম ৫৩২নং)*

প্রকাশ যে, প্রত্যেক (ছোট) শহর ও গ্রামের সকল মুসলিমদের জন্য একটি মাত্রই কবরস্থান থাকা উচিত। এবং অপ্রয়োজনে একাধিক কবরস্থান হওয়া আদৌ উচিত নয়। কারণ, প্রত্যেক গোষ্ঠি যদি নিজ নিজ কবরস্থান বানায় অথবা মাইয়্যেতকে যদি তার নিজস্ব মালিকানাভুক্ত জায়গায় দাফন করা হয় তাহলে অবশ্যই তাতে অহেতুক বত্র জমি-জায়গা অবরোধ হয়; আর এ ফলে যেখানে সেখানে কবর থাকা দরুন কবরের অসম্মানও হয় বেশী।

তাছাড়া পৃথক পৃথক গোরস্থান নিয়ে মুসলিমদের মাঝে বিছিন্নতা, বৈষম্য ও গর্ববোধ প্রকাশ পায়। যাতে সাম্য ও সম্প্রীতির ধর্ম ইসলামের কোন অনুমতি নেই।

একান্ত অনিবার্য কারণ ছাড়া ঠিক সূর্যের উদয়, অস্ত এবং ঠিক মাথার উপর থাকার সময় দাফন করা বৈধ নয়। উকবাহ বিন আমের ﷺ বলেন, 'তিনটি সময় এমন রয়েছে যাতে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নামায পড়তে এবং মাইয়্যেত দাফন করতে বারণ করতেন। আর তা হল, সূর্যোদয় শুরু হওয়া থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত, ঠিক সূর্য মাথার উপর আসা থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং অস্তের জন্য হলুদবর্ণ হওয়া থেকে অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সময়। *(মুসলিম ৮৩১, আবূ দাউদ ৩১৯২, তিরমিযী ১০৩০, নাসাঈ ৫৫৯, ইবনে মাজাহ ১৫১৯নং)*

তদনুরূপ অনিবার্য কারণ ছাড়া (রাত্রে মারা গেলে) রাতে-রাতেই দাফন করে দেওয়া বৈধ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ নিরুপায় না হলে (অধিক সংখ্যক মানুষের) জানাযা না পড়া পর্যন্ত রাত্রে মাইয়্যেত দাফন করার ব্যাপারে ভর্ৎসনা (নিষেধ) করেছেন। *(মুসলিম ৯৪৩, আবূ দাউদ ৩১৪৮নং প্রমুখ)*

পক্ষান্তরে রাতারাতি লাশ দাফন করা যদি জরুরীই হয়, তাহলে লাইট ইত্যাদির আলো ব্যবহার করে তা বৈধ। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বাতি জ্বালিয়ে এক ব্যক্তিকে কবরস্থ করেছেন।' *(তিরমিযী ১০৫৭, ইবনে মাজাহ ১৫২০নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১২৩৪নং)*

কোন মাইয়্যেতকে দাফন করার পর যদি দুর্ঘটনাগ্রস্ত তার বিচ্ছিন্ন হাত অথবা পা পাওয়া যায়, তবে ঐ অঙ্গের জন্য আর পৃথক গোসল ও জানাযার নামায নেই। বরং এমনিই দাফন করে দিতে হবে। আবার যদি মাইয়্যেতের কোন অঙ্গ ছাড়া দেহের অবশিষ্টাংশ না পাওয়া যায়, তবে যে অঙ্গ পাওয়া যাবে তারই গোসল, কাফন, নামায এবং দাফন কার্য সমাধা করা হবে। *(ফাতাওয়াত্ তা'যিয়াহ ২৩পৃঃ)*

কবর

কবরকে গভীর, প্রশস্ত এবং সুন্দর করে খনন করা ওয়াজেব। হিশাম বিন আমের ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা কবর খনন কর, প্রশস্ত কর এবং সুন্দর বানাও।" *(আবূ দাউদ ৩২১৫, নাসাই ২০০৯, আহমাদ ৪/১৯-২০প্রমুখ, সহীহ আবূ দাউদ ২৭৫৪নং)*

যে ব্যক্তি কবর খনন করবে তার জন্য রয়েছে বিরাট পরিমাণ সওয়াব। প্রিয়

নবী ﷺ বলেন, "--- আর যে ব্যক্তি (নেক নিয়তে) মাইয়্যেতের জন্য কবর খুঁড়বে এবং তাকে তাতে দাফন করবে আল্লাহ তার জন্য সেই ঘর তৈরী করে দেওয়ার সওয়াব জারী করে দেবেন; যা কিয়ামত পর্যন্ত বাস করতে দেওয়ার জন্য করা হয়।" *(হাকেম, বাইহাকী)*

বগলী ও সিন্দুকী উভয় প্রকার কবরই বৈধ। কারণ, নবী ﷺ-এর যুগে উভয় প্রকার কবরই প্রচলিত ছিল। আনাস বিন মালেক ؓ বলেন, মদীনায় কবর খননকারী ২টি লোক ছিল। একজন বগলী এবং অপরজন সিন্দুকী কবর খনন করত। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হলে সকলে বলল, 'আমরা আমাদের প্রভুর নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করব এবং দুজনকেই ডেকে পাঠাব। অতঃপর ওদের মধ্যে যে প্রথম উপস্থিত হবে তাকেই কবর খুঁড়তে দেব। তারপর উভয়কে ডেকে পাঠানো হলে বগলী (লহদ) কবর খননকারী আগে এসে উপস্থিত হল। সুতরাং নবী ﷺ-এর জন্য খনন করা হল বগলী কবর। *(ইবনে মাজাহ ১৫৫৭, আহমাদ ৩/৯৯প্রমুখ, সহীহ ইবনে মাজাহ ১২৬৪ নং)*

তবে উভয় প্রকার কবরের মধ্যে বগলী কবরই আফযল। কারণ এই কবরেই মহানবী ﷺ-কে দাফন করা হয়েছিল। সা'দ বিন আবী অক্কাস মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, 'আমার জন্য এক বগলী কবর খনন করো। অতঃপর (আমাকে তাতে রেখে) সাধারণভাবে (কাঁচা) ইঁট গেঁথে দিও; যেমন নবী ﷺ-এর জন্য করা হয়েছিল।'

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "বগলী কবর আমাদের এবং সিন্দুকী কবর অন্যান্য (নবীর উম্মত)দের।" *(আবূ দাঊদ ৩২০৮, তিরমিযী ১০৪৫, ইবনে মাজাহ ৪৭১১ নং, প্রমুখ)*

অবশ্য উলামাগণ সুবিধার জন্য বলেন, যে স্থানের মাটি আলগা ও নরম, সে স্থানের সিন্দুকী এবং যে স্থানের মাটি টাইট ও শক্ত; ধসার ভয় থাকে না, সে স্থানে বগলী কবর খনন করা উত্তম। *(দেখুন, মাজমূ, নওবী ৫/২৮৭, আউনুল মা'বূদ ৯/১৯ প্রভৃতি)*

প্রকাশ যে, বগলী কবরের সাধারণ দৈর্ঘ হবে ২০০ সেমি, গভীরতা ১৩০ সেমি। আর লহদের ৫৫ সেমি এবং প্রস্থ হবে ৫০ সেমি। *(আল বিজাযাহ)* অবশ্য মাইয়্যেতের দেহ অনুসারে কবরের পরিমাপ ছোট বড় হওয়াই স্বাভাবিক।

কবর খুঁড়তে কোন পুরাতন (মাইয়্যেতের) হাড় বাহির হলে তা যত্নের সাথে পুনরায় দাফন করা জরুরী। হাড় যেন কোন প্রকারে ভেঙ্গে না যায় - তা খেয়াল

রাখা আবশ্যিক। কারণ, পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "মৃত মুমিনের হাড় ভাঙ্গা জীবিতের হাড় ভাঙ্গার সমান।" *(আবূ দাউদ ৩২০৭, ইবনে মাজাহ ১৬১৬ নং আহমাদ ৬/৫৮, বাইহাকী ৪/৫৮ প্রমুখ, সহীহ আবূ দাউদ ২৭৪৬নং)*

আর এই কারণেই একান্ত নিরুপায় ও জরুরী না হলে মৃতের ময়না তদন্ত করা বা করতে দেওয়া অবৈধ। *(আহকামুল জানাইয ২৩৬পৃঃ, আবহাসু কিবারিল উলাম ২/৬৯)*

তবে মৃতার গর্ভে জীবিত সন্তান থাকলে তা অপারেশন করে বের করা ওয়াজেব। *(আহকামুল জানাইয ২৩৪পৃঃ)*

মাইয়্যেত অধিক হওয়ার কারণে প্রয়োজনে একই কবরে দুই বা ততোধিক লাশ দাফন করা বৈধ। এদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক দ্বীনদার ও কুরআন পাঠকারী লোককে আগে কবরে (কেবলার দিকে) রাখা হবে। জাবের ﷺ বলেন, 'উহুদের দিন নবী ﷺ শহীদদেরকে দাফন করার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুরআন হিফযকারী কে? অতঃপর কারো একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হলে তাকেই সর্বপ্রথম লহদে রাখা হল।' *(বুখারী ১৩৪৭, আবূ দাউদ ৩১৩৮, তিরমিযী ১০৩৬নং প্রমুখ)*

কিন্তু মহিলা ও পুরুষকে একই কবরে দাফন করা বৈধ নয়। অবশ্য একান্ত নিরুপায় অবস্থায় যদি নারী ও পুরুষকে একই কবরে দাফন করতেই হয়, তাহলে আগে পুরুষকে তারপর মহিলাকে রেখে উভয়ের মাঝে ইট, পাথর, বালি অথবা মাটির পর্দা (আড়াল) করে দিতে হবে। *(আহকামুল জানাইয ১৪৭পৃঃ টীকা, ইআশাঃ ১১৮৮৯- ১১৮৯৩নং)*

কবরে লাশ নামাবে পুরুষে। পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক হকদার হল মৃত ব্যক্তির অভিভাবক ও আত্মীয় স্বজনরা। কারণ, আল্লাহ তাআলার সাধারণ উক্তিতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে; তিনি বলেন,

﴿ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ ﴾

অর্থাৎ, বস্তুতঃ আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে পরস্পর (অন্য অপেক্ষা) অধিক হকদার। *(সূরা আনফাল ৭৫ আয়াত)*

আর আলী ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে গোসল দিলাম। অতঃপর মরণের প্রভাব তাঁর চেহারায় দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। তিনি জীবন ও মরণ উভয় অবস্থাতেই ছিলেন চির সুন্দর।

তাঁর দাফন কার্যের ভার অর্পিত ছিল চার ব্যক্তির উপর; আলী, আব্বাস, ফায্ল এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর স্বাধীনকৃত ক্রীতদাস সালেহ। আল্লাহর রসূল ﷺ এর জন্য লহদ তৈরী করে তাতে তাঁকে রেখে (কাঁচা) ইট গেঁথে দেওয়া হয়েছিল।' *(হাকেম ১/২৬২, বাইহাকী ৪/৫৩)*

স্ত্রীর লাশ তার স্বামী নামাতে পারে। তবে শর্ত হল সে যেন গত রাত্রে (অন্য) স্ত্রী সহবাস না করে থাকে। তা করে থাকলে তার জন্য লাশ নামানো বিধেয় নয়। বরং এ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মীয় অথবা কোন বেগানাই লাশ নামাবে। অবশ্য তাদের ক্ষেত্রেও এ শর্ত পালনীয়। কারণ, আনাস ؓ বলেন, 'নবী ﷺ এর এক কন্যা (উম্মে কুলষূম)এর দাফন কার্যের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, আল্লাহর রসূল ﷺ কবরের পাশে বসে আছেন। আর তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত ছিল। অতঃপর (লাশ নামানোর সময়) তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে (গত) রাত্রে স্ত্রী সহবাস করেনি?" আবু তালহা বললেন, 'আমি আছি, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি ওর কবরে নামো।" এ শুনে আবূ তালহা কবরে নামলেন। *(বুখারী ১২৮৫নং, হাকেম ৪/৪৭, বাইহাকী ৪/৫৩, আহমাদ ৩/১২৬ প্রমুখ)*

অবশ্য মহিলার লাশের ক্ষেত্রে যদি তার বেগানা কোন পুরুষ কবরে নামে তাহলে একান্ত সৎ ও বৃদ্ধ লোক হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাহরাম হওয়া শর্ত নয়।

কবরের পায়ের দিক হতেই লাশ নামানো সুন্নত। আবূ ইসহাক বলেন, হারেস অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁর জানাযার নামায যেন আব্দুল্লাহ বিন যায়দ পড়ে। সুতরাং আব্দুল্লাহ তাঁর জানাযা পড়লেন। অতঃপর কবরের পায়ের দিক হতে তাঁকে কবরে নামালেন এবং বললেন, এভাবে লাশ নামানো সুন্নাহ (নবী ﷺ-এর তরীকা)।" *(ইবনে আবী শাইবাহ ৪/১৩০, আবূ দাউদ ৩২১১, বাইহাকী ৪/৫৪)*

অনুরূপ ছিল আনাস ؓ-এর আমলও। *(আহমাদ ৪০৮১নং, ইআশা ৪/১৩০)*

বলা বাহুল্য, লাশের মাথার দিক হতে লাশ নামানোর হাদীস সহীহ নয়। *(আকামুল জানাইয, আলবানী ১৫০-১৫১পৃঃ)*

কবরে নেমে যে ব্যক্তি লাশ রাখবে, কেবল সেই ব্যক্তিই ঐ সময় নিম্নের দুআ পাঠ করবেঃ-

'h i $)]'$, & h #R1

উচ্চারণ, বিসমিল্লাহি অআলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ। অথবাঃ-

'h i $)]& , & h #R1

উচ্চারণ, বিসমিল্লা-হি অআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।

অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে এবং তাঁর রসূলের তরীকা বা মিল্লাতের নিয়মানুসারে (লাশ রাখছি)। *(আবূ দাউদ ৩২১৩, ইবনে মাজাহ ১৫৫০, হাকেম ১/৩৬৬, বাইহাকী ৪/৫৫, তিরমিযী ১০৪৬নং)*

হাকেমের এক বর্ণনায় শুরুতে 'বিসমিল্লাহি অবিল্লা-হি----' শব্দ এসেছে।

মাইয়্যেতকে তার কবরে (পিঠ ও মাথার নিচে কিছু মাটি বা ঢেলা রেখে) ডান পার্শ্বে শায়িত করবে। তার মুখমন্ডল হবে কেবলার প্রতি, মাথা হবে কেবলার ডাইনে এবং পা দুটি কেবলার বামে (উত্তর-দক্ষিণে)। *(মুহাল্লা ৫/১৭৩, আহকামুল জানাইয ১৫১পৃঃ)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "কা'বা হল তোমাদের জীবিত ও মৃত সকলের জন্য কেবলাহ।" *(আবূ দাউদ ২৮৭৫নং, নাসাঈ, হাকেম ১/৫৯, ৪/২৫৯, বাইহাকী ৩/৪০৮-৮০৯)*

লাশ রাখার পর কাফনের বাঁধনগুলো খুলে দেওয়া প্রসঙ্গে যদিও কোন সহীহ হাদীস মহানবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হয়নি, তবুও কিছু সংখ্যক আষার দ্বারা বুঝা যায় যে, এমন আমল সলফের যুগে প্রচলিত ছিল। সুতরাং বাঁধন খোলা বিধেয়। *(দেখুন, ইবনে আবী শাইবাহ ১১৬৬৯- ১১৬৭৩নং, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪/২৫৭, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪৮১)*

পক্ষান্তরে মাইয়্যেতের চেহারা খুলে রাখার কোন ভিত্তি বা দলীল সুন্নাহতে নেই। মাইয়্যেত মুহরিম হলে তার চেহারা ও মাথা খোলা থাকবে।(মহিলা হলে পর্দার আবরণ থাকা জরুরী।)

অনেকে (পুরুষ মাইয়্যেতের) ডান গাল খুলে মাটিতে লাগিয়ে দেওয়া বিধেয় মনে করেন। কারণ, এরূপ করতে উমার রাঃ অসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং তা সত্য হলেও পূর্ণ চেহারা খুলে রাখার কথা প্রমাণ হয় না। *(দেখুন, আশ্‌শারহুল মুমতে', ইবনে উষাইমীন ৫/৪৫৬)*

এরপর মাথার দিক থেকে কাঁচা ইঁট পরস্পর থাকিয়ে কাদা লেপে বগলী কবরের ফাঁক বন্ধ করবে।

কবর খননের সময় প্রথম চোটের মাটি লাশের বুকের উপর রাখা বিদআত। তদনুরূপ লাশের জন্য কবরের ভিতর (মাটির) বালিশ করা, অপ্রয়োজনে বালি বিছানো, গোলাপ পানি ছিটানো, ঢেলা বা মাটিতে কোন সূরা বা দুআ পড়ে,

কোন আয়াত বা দুআ কাগজে লিখে, কা'বা শরীফের গিলাফের টুকরা, কোন বুযুর্গের ব্যবহৃত কাপড় বা অন্য কিছু কবরের ভিতর রাখা বিদআত ও অবৈধ। এ সবে কবরের আযাব লাঘব হবে মনে করাও অমূলক ধারণা। *(আহকামুল জানাইয অবিদাউহা দ্রষ্টব্য)*

মহিলার লাশ কবরে রাখার সময় পর্দা করা এবং অপ্রয়োজনে লোকেদের কবরের নিকট ভিঁড় না করা বাঞ্ছনীয়। লাশের উপর যারা ভিঁড় করে তাদেরকে হাসান (রঃ) 'শয়তান' বলে আখ্যায়ন করেছেন। তা ছাড়া এটি বিদআত। *(ইআশাঃ ১১৯৯০-১১৯৯১নং, মুহাল্লা ৫/১৭৮)*

সিন্দুকী কবরে লাশ রাখার পর বাঁশের টৌঁটা বা পাটা ও তার উপর খড় আদি রাখার সময় টৌঁটার নিচে কাপড় রেখে নেওয়া ও পরে গুটিয়ে বের করে নেওয়া উত্তম, যাতে লাশের উপর মাটি বা কুটা না পড়ে।

যে স্থানের মাটি একান্ত বালি অথবা কাদাময়, সেখানে গর্ত খুঁড়তেই ধস নামে সেখানে তাবুতের (কাঠের শবাধার) মাঝে লাশ রেখে দাফন করা যায়। যেমন, যেখানে গর্ত খুঁড়তেই (বিশেষ করে বর্ষাকালে ও বন্যার সময়) ঝর্ণা ঝরে সেখানে কবরের নিচে কলাগাছের ভেলার উপর লাশ রেখে দাফন করা দূষণীয় নয়।

সমুদ্রের মাঝে জলজাহাজে কারো মৃত্যু হলে এবং তীরে জাহাজ লাগতে অসাধারণ দেরী হলে এবং ফ্রিজ না থাকলে ও লাশের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে গোসল-কাফন দিয়ে জানাযা পড়ে পিঠের নিচে একটি ভারি কিছু বেঁধে সমুদ্রে সলিল-সমাধি দেওয়াও প্রয়োজনে বৈধ। *(ইবনে আবী শাইবাহ ১১৮৪৯-১১৮৫০নং)*

কাঁচা ইঁট ও টৌঁটা দ্বারা কবর বন্ধ করার পর উপস্থিত সকলের জন্য মুস্তাহাব, দুই হাত দিয়ে মাটি বা কাদার ডাব নিয়ে (সুবিধামত দাঁড়িয়ে অথবা বসে) মাথার দিক হতে ৩ বার কবরে রেখে কবর বন্ধ করা। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ এক জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর তিনবার মাইয়্যেতের (কবরের) উপর মাটি দিলেন।" *(ইবনে মাজাহ ১৫৬৫নং, ইরওয়াউল গালীল ৭৪৩নং)*

মাটি দেওয়ার সময় মুখে পঠনীয় কোন দুআ নেই। 'মিনহা খালাকনা-কুম--' পাঠ করা বিদআত। *(আহকামুল জানাইয ১৫৩পৃঃ টীকা)*

কবর তৈরী হয়ে যাওয়ার পর তার উচ্চতা হবে মাত্র আধহাত; যাতে কবর বলে চেনা যায় এবং সম্মানহানির হাত হতে রক্ষা পায়। জাবের ﷺ বলেন,

'নবী ﷺ-এর জন্য লহদ (বগলী) কবর তৈরী করা হয়েছিল। অতঃপর (তাঁকে তাতে রেখে) কাঁচা ইঁট থাকানো হয়েছিল। আর মাটি থেকে তাঁর কবর উঁচু করা হয়েছিল আধ হাত মত। *(ইবনে হিব্বান ২১৬০নং, বাইহাকী ৩/৪১০)*

কিন্তু সিন্দুকী (আমাদের দেশের সাধারণতঃ) কবরের উচ্চতা এতটুকুই হলে হিংস্র জন্তুরা তা খুলে লাশের উপর অত্যাচার করতে পারে অথবা লাশ বের করে নিতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কবরের চারিপাশের মাটি আধ হাত বা তার বেশী খাপিয়ে নিয়ে তাতে ঢোটা বা পাটা রাখলে উপরের মাটির ঘনত্ব মোটা হবে এবং খোলার ভয় আর থাকবে না। আর উচ্চতাও হবে আধ হাত।

এরপর মাটি বেড়ে গেলে কোন ক্ষতি নেই। মাটি বাড়লেই আবার হালেই কেউ মরবে এই ধারণা কাল্পনিক ও অলীক।

কবরের আকৃতি হবে উটের কুজেঁর মত। সুফিয়ান তাম্মার বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ আবূ বাকার ও উমার ﷺ-এর কবরকে উঁটের কুঁজের মত দেখেছি।

বগলী কবর তৈরী হওয়ার পর যেহেতু তার মাটি শুষ্ক থাকে, তাই তার উপর পানির ছিটা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া দূষণীয় নয়। তবুও এ প্রসঙ্গে হাদীসগুলি দুর্বল। *(ইরওয়াউল গালীল ৭৫৫নং)* কিন্তু সিন্দুকী কবরের উপর দেওয়ার মাটি সাধারণতঃ কাদা হয়, তাই কবর প্রস্তুত করতে যে পরিমাণ পানি লাগে তাই দেওয়াই দরকার। কবর প্রস্তুত হওয়ার পর আর 'কবর লোয়ানো' বলে কোন কিছু সংস্কার নেই। সুতরাং এই সময় কলেমার যিক্‌রের সাথে কবরের মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত তিনবার পানি ঢালা নিষ্প্রয়োজন ও বিদআত। *(আহকামুল জানাইয)*

এরপর কবরের শিয়রে পাথর ইত্যাদি রেখে চিহ্ন দেওয়া সুন্নত। মুত্তালিব বিন আবী অদাআহ বলেন, 'উষমান বিন মাযউন ﷺ ইন্তেকাল করলে তাঁর লাশ দাফন করা হল। অঃপর নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনতে আদেশ করলেন। লোকটি পাথরটিকে তুলতে সক্ষম না হলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর জামার আস্তিন গুটালেন। যিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, 'আল্লাহর নবী ﷺ যখন আস্তিন গুটালেন তখন তাঁর উভয় হাতের শুভ্রতা যেন এখনো আমার চোখে চোখে ঘুরছে।' অতঃপর তিনি নিজেই তা বহন করে

কবরের মাথার দিকে রাখলেন এবং বললেন, “এতে আমার ভায়ের কবর চিনতে পারব এবং আমার পরিজনের মধ্যে যে মারা যাবে তাকে ওর পাশে দাফন করব।” *(আবূ দাউদ ৩২০৬নং, বাইহাকী ৩/৪১২)*

দাফনের পর তালকীন বা আযান কিছু নেই। শুদ্ধ প্রমাণ না থাকার জন্য এসব বিদআত। *(দেখুন, আহকামুল জানাইয ১৫৫পৃঃ)* বরং এই সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মাইয়্যেতের জন্য দুআ করতে হয়; যাতে সে কবরে ফিরিশ্তার প্রশ্নের জওয়াব ঠিকমত দিতে পারে। কর্তৃপক্ষ বা ইমাম উপস্থিত সকলকে দুআ করতে আদেশ করবেন।

দুআ এই রূপ করবেঃ-

আল্লাহুম্মাগফির লাহু আল্লাহুম্মা সাব্বিতহু #$& *+ #%&

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা কর, ওকে মুনকির-নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে টিকিয়ে রাখ---- ইত্যাদি। উযমান বিন আফ্ফান ﷺ বলেন, ‘নবী ﷺ মাইয়্যেত দাফন করা শেষ হলে তার কবরে দাঁড়িয়ে বলতেন, “তোমরা তোমাদের ভায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (প্রশ্নের জওয়াবে) প্রতিষ্ঠিত থাকার তওফীক চাও। কারণ ওকে এখনই প্রশ্ন করা হবে।” *(আবু দাউদ ৩২২১নং, হাকেম ১/৫৭০, বাইহাকী ৪/৫৬)*

আরবী দুআ না জানলে নিজের ভাষাতেই অনুরূপ দুআ করবে সকলেই। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের একাকী দুআ করাই বিধেয়। পক্ষান্তরে জামাআতী দুআ; অর্থাৎ একজন বা ইমামের দুআ করা এবং বাকী সকলের (হাত তুলে) ‘আমীন-আমীন’ বলা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নত নয়। আর না-ই তা খোলাফায়ে রাশেদীন বা কোন সাহাবার তরীকা। এখানে আল্লাহর রসূল ﷺ কেবল সকলকে উক্তরূপ দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। এতে প্রত্যেকে নিজে নিজের মনে দুআ করতেন। তাঁরা জামাআতী দুআ করতেন না। তা করা উত্তম হলে নিশ্চয়ই রসূল ﷺ দুআর আদেশ না করে নিজে হাত তুলে দুআ করতেন এবং সাহাবাগণও অনুরূপ করতেন। কারণ, ভালো-মন্দের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে তাঁরাই সব রকমের জ্ঞান অধিক রাখতেন। আর তা উত্তম হলে আমাদের আগে তাঁরাই করে যেতেন। অথচ তার কোন প্রমাণ নেই। *(দেখুন, ফাতাওয়াত তা’যিয়াহ, ইবনে উষাইমীন ৩১পৃঃ)*

এ স্থলে এও খেয়াল রাখা উচিত যে, যে দুআ করা হবে তা যেন মৃতের আত্মার জন্য কল্যাণমূলক হয়। অপ্রাসঙ্গিক লম্বা দুআও এখানে বিধেয় নয়।

অতঃপর কবরের শিয়রে ও পদতলে পঠনীয় কোন সূরা বা আয়াত নেই। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত কোন হাদীসই সহীহ নয়।

দাফনের পর কিছু সময় অপেক্ষা করার ব্যাপারে অসিয়ত করেছিলেন সাহাবী আম্র বিন আল-আস। তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, '----অতঃপর আমি মারা গেলে আমার জানাযার সাথে যেন কোন মাতমকারী ও কোন প্রকার আগুন না যায়। তারপর আমাকে তোমরা কবরে রাখার পর আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি ঢেলে দিও। আমার কবরের পাশে ততক্ষণ অবস্থান করো যতক্ষণ একটি উঁটনী যবেহ করে তার গোশ্ত ভাগ করতে সময় লাগে। যাতে আমি তোমাদেরকে কাছে পেয়ে আমার আতঙ্ক দূর করতে পারি এবং আমার প্রতিপালকের দূতকে কি জওয়াব দেব তা ভেবে নিতে পারি।'

অবশ্য এটা ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ। নচেৎ ঐরূপ বিধেয় হলে অবশ্যই নবী ﷺ তা সকলের জন্য নির্দেশ দিয়ে যেতেন। *(দেখুন, আসইলাতুন অআজবিবাতুন আ'ন আলফাযিন অমাফাহীমা ফী মীযানিশ শারীআহ, ইবনে উষাইমীন ২/৬০-৬১)*

দাফন চলাকালে বসে বসে ইমামের নসীহত করা এবং মৃত্যু সম্পর্কে সকলকে অবহিত ও সতর্ক করা, রূহের অবস্থা ও অবস্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করা বৈধ। (যেমন পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। অন্যথা এই সময় বিতর্কিত কোন বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক অথবা কোন পার্থিব বিষয় নিয়ে হৈ-হাল্লা করা বৈধ নয়। বরং এ সময়ে কেবল পরপারের পথিকের পথ ও যাত্রা নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় নীরব ও শান্ত থাকাই উচিত। *(ফাতাওয়াত তা'যিয়াহ ৩৪ পৃঃ)*

দাফনের পর কোন সঠিক কারণ ও প্রয়োজনে কবর খুলে লাশ বের করা ও পুনঃ দাফন করা বৈধ। জাবের ؓ বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে দাফন করার পর আল্লাহর রসূল ﷺ তার কবরের কাছে এলেন। অতঃপর তিনি তার লাশ বের করতে আদেশ করলেন। সে লাশ তাঁর হাঁটুর উপরে রেখে তার উপর থুথু মারলেন এবং তাঁর নিজের কামীস পরিয়ে দিলেন।'

জাবের ؓ আরো বলেন, 'অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়লেন। আর এর কারণ আল্লাহই অধিক জানেন। তবে আব্দুল্লাহ আব্বাস ؓ-কে একটি কামীস

পরিয়েছিল। *(বুখারী ১৩৫০, মুসলিম ২৭৭৩নং)*

প্রস্তুতি স্বরূপ পূর্বে নিজের জন্য কবর খুঁড়ে রাখা বিদআত। যেহেতু একাজ নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণের কেউই করে যান নি। তা ছাড়া মানুষ জানে না যে, তার মৃত্যু কখন ও কোথায় ঘটবে। *(আহকামুল জানাইয ১৬১ ও ২৫৭পৃঃ)*

কবরের উপর খেজুর ডাল গাড়া আমাদের জন্য বিধেয় নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ দুটি কবরের পাশ দিয়ে পার হওয়ার সময় ওহী মারফৎ জানতে পারলেন যে, উভয় মাইয়্যেতের আযাব হচ্ছে।--- অতঃপর তিনি একটি ভিজে খেজুর ডাল মাঝামাঝি ফেড়ে দুই ভাগ করে কবরে গেড়ে দিলেন।

সাহাবাগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এরূপ কেন করলেন?' তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ ডাল দুটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওদের গোর আযাব হাল্কা হবে।" *(বুখারী ১৩৬১, মুসলিম ৩০১২নং)*

উক্ত ঘটনাটি ছিল আল্লাহর রসূল ﷺ এবং উক্ত দুই কবরের জন্য খাস (বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র ব্যাপার)। কারণ, নবী ﷺ তাদের কবরে আযাব হচ্ছে জেনেই ডাল গেড়েছিলেন এবং এ ছাড়া আর অন্য কোন কবরে গাড়েন নি। অথচ তা যদি সুন্নাহ বা বিধেয় হত তাহলে প্রত্যেকের কবরেই অনুরূপ খেজুর ডাল গাড়তেন। তারপর তাঁর খেলাফায়ে রাশেদীন এবং বড় বড় সাহাবাগণও এরূপ করে যান নি। বিধেয় হলে তাঁরা এ কাজে নিশ্চয়ই অগ্রগামী হতেন।

বুরাইদা ﷺ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর কবরে দুটি খেজুর ডাল গাড়তে অসিয়ত করেছিলেন। এ কথা সত্য হলেও তা ছিল তাঁর ইজতিহাদ মাত্র। আর মুজতাহিদ ভুলও করতে পারেন এবং সঠিকও। আর এ ব্যাপারে সঠিক আমল তাঁদের ছিল যাঁরা এ কাজ করে যাননি। *(ফাতহুল বারীর টীকা, ইবনে বায ৩/২৬৪)*

সুতরাং সাধারণভাবে কবরে (১, ২, ৩, ৪, বা ৫টি) খেজুর অথবা অন্য কোন ডাল গাড়া বিদআত। আর উক্ত হাদীস শুনে ডাল গাড়ায় একজন মুসলিম মাইয়্যেতের প্রতি কুধারণা এই হয় যে, তার কবরে আযাব হচ্ছে, তাই এতে হাল্কা হয়ে যাবে। তাছাড়া এ কথা আমাদের জানা নেই যে, ঐরূপ করা হলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মত আমাদের সুপারিশও গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে তাঁর পরে আর কারো সে জ্ঞানও নেই এবং সে হাতও। *(দেখুন সাবঊনা সুআলান ৩৪ পৃঃ)*

বাকী জন্তু-জানোয়ারের খোঁড়ার ভয়ে কবরের উপর কাঁটা ইত্যাদি রাখা

দূষণীয় নয়। তদনুরূপ কবরের উপর মসুরী ডাল ছড়ানো উক্ত উদ্দেশ্যে বৈধ। নচেৎ বিদআত।

অমাবস্যার সন্ধ্যায় বা রাত্রে দাফন হলে নাকি কবর পাহারা দিতে হয়। এটা কোন শরয়ী বিধান নয়। তবে লাশের মাথা চুরি হওয়ার কথা যদি সত্য হয়, তবে পাহারা দেওয়াই উচিত। যেমন যেখানে কাফন চোরের(?) ভয় থাকে সেখানে অমাবস্যা না হলেও পাহারা দেওয়া কর্তব্য। যাতে লাশের কোন প্রকার ক্ষতি ও সম্মানহানি না হয়।

মৃতদেহের মাংসাদি নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যদি কবর ধসে গিয়ে লাশ বের হয়ে যায়, তবে নবরূপে কবর পুনর্নির্মাণ করা উচিত। যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায় ও জন্তু জানোয়ার লাশের ক্ষতি না করতে পারে। এরূপ করলে মৃতের আযাব বাড়বে ধারণা ভিত্তিহীন।

কবরের নিকট পশু যবেহ করা, কবর আধ হাতের অধিক উঁচু করা, পলস্তরা ও চুনকাম করা, কবরের উপর কবরবাসীর নাম, প্রশংসা, কবিতাছত্র, কুরআনী আয়াত, জন্ম-মৃত্যু তারীখ, 'জান্নাতী', 'মরহুম', 'মগফুর' ইত্যাদি লিখা, তার উপর ঘর, গম্বুজ বা মাযার নির্মাণ, তার উপর বসা ইত্যাদি হাদীস সূত্রে নিষিদ্ধ ও হারাম। *(আহকামুল জানাইয)*

দাফন কাজ সেরে এসে হাত-পা না ধুয়ে ঘর ঢুকতে নেই বা কাউকে স্পর্শ করতে নেই মনে করা, দাফন শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাইয়্যেতের আত্মীয়-পরিজনদের আহার ভক্ষণ না করা , ব্যবহারযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মাটির কলসি ইত্যাদি কবরের পাশে উবুড় করে ফেলে আসা, দাফনের কাজে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বাঁশ অথবা কাফনের উদ্বৃত্ত কাপড় বা সাবানাদি বাড়ির লোকের ব্যবহার না করা বিদআত। এ সবে অমঙ্গল হয় এমন ধারণা ভিত্তিহীন ও অলীক।

কবরের উপর কোন প্রকারের গাছ অথবা ফুল গাছ লাগানো বৈধ নয়। কারণ এই গাছেই পরবর্তী কালে শির্কের আড্ডা হতে পারে। পক্ষান্তরে কবর চিহ্নিত করার জন্য পাথর ব্যবহারে অনুমতি আছে। বৃক্ষ রোপণে নয়। *(মু'জামুল বিদা' ১৪৮পৃঃ)*

পক্ষান্তরে প্রকৃতিগতভাবে যে গাছ কবরস্থানে উদ্গত হয় তা তাযীমযোগ্য নয়। তা কাটা যায় এবং কবরস্থান ঘেরার কাজে বা অন্য কোন ওয়াফ্ফের

কাজে ব্যবহার করা যায়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন)*

সমবেদনা প্রকাশ

“যে যাবার সে চলে যায় ফিরে নাহি আসে গো,
সে আঁধার অমানিশায় চাঁদ নাহি হাসে গো।”

মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন যেহেতু শোকাহত, তাই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করা মুসলিমের কর্তব্য। সমবেদনা প্রকাশ হবে তাদেরকে সওয়াব স্মরণ করিয়ে ধৈর্য ও সহ্যের তাকীদ করে এবং তাদের জন্য ও মাইয়্যেতের জন্য নেক দুআ করে।

যে ব্যক্তি অনুরূপ সমবেদনা প্রকাশার্থে এবং মড়াবাড়ির লোকদেরকে সান্ত্বনা দিতে যায়, তার জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান। বিশ্বনবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মসীবতের সময় তার মুসলিম ভাইকে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করে তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সবুজ রঙের লেবাস পড়াবেন; যা অন্যান্য লোকে দেখে ঈর্ষা করবে।” *(তারীখে বাগদাদ, খতীব, ৭/৩৯৭, তারীখে দিমাশ্ক, ইবনে আসাকির ১৫/৯১/১, ইবনে আবী শাইবাহ ৪/১৬৪, ইরওয়াউল গালীল৭৫নং)*

সমবেদনা প্রকাশ করার সময় এমন কথা বলা কর্তব্য যাতে মাইয়্যেতের আত্মীয়-স্বজন সান্ত্বনা পায়, দুঃখের ভার হাল্কা হয়, আল্লাহর তকদীরে সন্তুষ্টি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তকদীরে যা ছিল তা-ই হয়েছে মনে করে ধৈর্যের বাঁধ না ভাঙ্গে।

সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বহু পরিবারকেই অনুরূপ সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর সেই মধুমাখা কথামালা স্মরণে থাকলে তো অতি উত্তম। নচেৎ নিজের তরফ থেকে সেইরূপ কথা বলা কর্তব্য, যা বিপদগ্রস্তের মনে শান্তির মলম হয়, আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং তা যেন শরীয়তের অনুকূল হয়।

প্রিয় রসূল ﷺ হতে যে সব কথামৃত প্রমাণিত তার কিছু নমুনা নিম্নরূপঃ-

১। এক ব্যক্তির ছেলে মারা গেলে তাঁকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়ার সময়

তিনি বললেন,“হে অমুক! তোমার নিকট কোন্টা অধিক পছন্দনীয় ছিল? তোমার ছেলেকে নিয়ে দুনিয়াতে সুখ উপভোগ করা, নাকি কাল যখন তুমি জান্নাতে যে কোন দরজায় যাবে, তখন সে তোমার আগে পৌঁছে তোমার জন্য দরজা খুলে দেবে সেটা?”

লোকটি বলল, ‘হে আল্লাহর নবী! বরং সে আমার আগে জান্নাতে গিয়ে আমার জন্য তার দরজা খুলবে এটাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।’ মহানবী ﷺ বললেন, “অতএব তাই তুমি পাবে। (ধৈর্য ধর)।” *(নাসাঈ ২০৮৭নং, হাকেম ১/৩৮৪, আহমাদ ৫/৩৫)*

২। প্রিয় রসূল ﷺ-এর কন্যা যয়নাব (রাঃ)এর এক শিশু-সন্তানের অন্তিম অবস্থা হলে তিনি পিয়ারা আব্বাকে ডেকে পাঠালেন। মহানবী ﷺ এক সাহাবী দ্বারা কন্যাকে সালাম দিয়ে এবং এই বলে পাঠালেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তো তাঁরই ছিল। আর যা দিয়েছিলেন তাও তাঁরই ছিল। (জন্ম-মৃত্যু) সব কিছুই তাঁর নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে ঘটে থাকে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধরে এবং সওয়াবের আশা রাখে।” *(বুখারী ১২৮৪, মুসলিম ৯২৩নং, আহমাদ ৫/ ২০৪, ২০৬, ২০৭, প্রমুখ)*

৩। এক মহিলার শিশু সন্তান মারা গেলে তিনি তাকে সাক্ষাৎ করে বললেন, “আমি শুনলাম যে, ছেলেটি মারা যাওয়ায় তুমি বড় ধৈর্যহারা হয়েছ।” অতঃপর তাকে তিনি আল্লাহভীতি ও সহনশীলতার উপদেশ দিলেন। মহিলাটি বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! কেন আমি ধৈর্যহারা হব না? আমি যে মৃতবৎসা নারী। ওই আমার একমাত্র ছেলে ছিল। আর হবে বলেও আশা নেই।’

প্রিয় নবী বললেন, “(তুমি মৃতবৎসা বা যার সন্তান বাঁচে না সে নারী নও।) কারণ প্রকৃত মৃতবৎসা সেই যার কোন সন্তান মারা যায় নি। (যেহেতু আখেরাতে উপকারে আসবে এমন সন্তানের মা-কে সন্তানহীনা মড়ুঞ্চে বলা হয় না।) শোন, যে কোন পুরুষ অথবা মহিলার তিনটি শিশুসন্তান মারা গেলে এবং তারা তাতে ধৈর্যধারণ করলে, তার প্রতিদানে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত প্রবেশ করাবেন।’ উমার ﷺ নবী ﷺ-এর ডাইনে বসেছিলেন। তিনি বললেন, ‘আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আর যদি দুটি সন্তান মারা যায়?’ প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, “আর দুটি সন্তান মারা গেলেও (জান্নাত

পাবে)।' *(হাকেম ১/৩৮৪)*

৪। আবূ সালামাহর ইন্তেকাল হলে তিনি উম্মে সালামাহকে সাক্ষাৎ করে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামাহকে মাফ করে দাও। ওর মর্যাদা উন্নীত করে ওকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের দলভুক্ত কর। ওর বাকী বংশধরের মধ্যে ওর উত্তরসুরি দান কর। তুমি আমাদেরকে এবং ওকে ক্ষমা করে দাও হে সারা জাহানের প্রতিপালক! আর ওর জন্য ওর কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তা আলোকময় করে দাও।" আর নবী ﷺ উম্মে সালামাহকে এমন এক দুআ শিখিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে তিনি হারিয়ে যাওয়া জিনিসের চেয়ে উত্তম জিনিস পেয়েছিলেন। *(মুসলিম ১৫২৮ক, ইবনে মাজাহ ১৪৪৪ক, বুখারী ১৫২৫ক)*

৫। জা'ফর ইন্তেকাল করলে তিনি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে সাক্ষাৎ করে দুআ করেছিলেন, "হে আল্লাহ! তুমি জা'ফরের বংশধরে ওর অনুরূপ উত্তসূরি দান কর। আর আব্দুল্লাহর ব্যবসায় বর্কত দান কর।" এই দুআ তিনি ৩ বার করলেন। *(আহমাদ ১৭৫০নং, হাকেম ৩/২৯৮)*

সমবেদনা প্রকাশে মুস্তাহাব হল, এতীমের মাথায় হাত বুলানো ও তার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা। পুর্বোক্ত আব্দুল্লাহর মাথায় হাত বুলিয়ে দয়ার নবী ﷺ দুআ করেছিলেন। *(আহমাদ ১৭৬০নং, হাকেম ১/৩৭২, বাইহাকী ৪/৬০)*

এই সময় শোকাহত ব্যক্তিদেরকে এ খবর দেওয়াও উচিত যে, তারা কাঁদাকাটি করলে তাদের মাইয়্যেতের আযাব হবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭২৪নং)* মাতম করা জাহেলিয়াতের কাজ। তওবা না করলে কিয়ামতে আযাব হবে। *(মুসলিম, মিশকাত ১৭২৭নং)* ইত্যাদি।

আর এই সময় এমন কথা না বলা বা এমন ঘটনার উল্লেখ না করা উচিত, যাতে শোকতপ্ত মানুষের শোক আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা, বিস্মৃত স্মৃতির স্মরণে ব্যথিত হৃদয় মোচড় দিয়ে ওঠে। পুরনো ব্যথা পুনরায় নতুন করে জেগে ওঠে।

ঈমানের আলোকে আলোকমন্ডিত, তাকওয়ার ফুল-ফলে পরিশোভিত এবং সহায়তা ও সহানুভুতিতে সদাজাগ্রত যে সমাজ, সে সমাজেরই নিকট হতে এমন সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহারের আশা করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۝ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ۝ ﴾

অর্থাৎ, শপথ মহাকালের! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু ওরা নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ এবং পরস্পরকে যারা সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। *(সূরা আস্‌র)*

সমবেদনা প্রকাশের জন্য কোন দিন-ক্ষণ নেই, কোন সীমাও নেই। তিন দিন পার হয়ে গেলেও সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে মাইয়্যেতের আত্মীয়-স্বজনকে দেখা করা উচিত। তাদের শোকব্যথা দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সাক্ষাৎ করে এই কাজ করা উচিত।

সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বাড়ি, কবরস্থান বা মসজিদে সকলের জমায়েত হওয়া এবং আগতদের জন্য মড়াবাড়ির লোকেদের বিশেষ পানাহার তৈরী করা বৈধ নয়। কারণ, এটা মাতমের পর্যায়ভুক্ত যা জাহেলিয়াতের কর্ম এবং তা হারাম। (*আহমাদ, ইবনে মাজাহ)*

প্রথম সাক্ষাতে মুসাফাহা সুন্নত। নচেৎ সমবেদনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ মুসফাহা, কোলাকুলি বা চুম্বন নেই। *(সাবউনা সুআলান ২৮পৃঃ)*

এই উদ্দেশ্যে দূর থেকে সফর করাও বিধেয় নয়। তবে শোকাহত ব্যক্তি যদি একান্ত নিকটাত্মীয় কেউ হয় এবং দেখা করতে না গেলে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার শামিল হয়, তাহলে সফর করা বৈধ। *(ফাতাওয়াত তা'যিয়াহ ৯পৃঃ)*

পত্রিকার মাধ্যমে সমবেদনা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তা বৈধ নয়। *(ঐ ৭পৃঃ)*

দেখা-সাক্ষাৎ ও সান্ত্বনা দানের সময় কুরআন পাঠ বিধেয় নয়। যা বিধেয় তা হল মাইয়্যেত ও তার পরিবারের জন্য দুআ করা। পক্ষান্তরে এই উপলক্ষে সূরা ইয়াসীন বা অন্য কোন কুরআনের সূরা অথবা আয়াত পাঠ করা বিদআত। *(ঐ ৪৬পৃঃ)*

অনুরূপ উক্ত সময় ওয়ায-নসীহত করা, মর্সিয়াখানি বা রকমারি খাদ্যসামগ্রী নিবেদন করাও বিদআত। *(ঐ ৪৬-৪৭পৃঃ)* (অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠানো বিধেয়।) এই সময় শোকাহত লোকেদের বিশেষ ধরনের (যেমন কালো) লেবাস পরিধান করাও বিদআতের পর্যায়ভুক্ত। *(ঐ ৩৮পৃঃ)*

সমবেদনা প্রকাশার্থে মহিলারাও পর্দার সাথে যাবে। মাহরাম না হলে লাশ দেখা জরুরী নয়। বরং পুরুষের লাশের নিকট বেগানা মহিলাদের ভিঁড় করা এবং মাইয়্যেতের আত্মীয় স্বজনের নিকট বেপর্দায় সমবেদনা প্রকাশ করতে

যাওয়া হারাম। মাইয়্যেতের আত্মীয়রা মাহরাম (অগম্য) হলে তাদেরকে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করবে। নচেৎ পর্দার সাথে রাত্রে অথবা লাশ নিয়ে পুরুষরা বের হয়ে গেলে সেই সময় গিয়ে মড়াবাড়ির মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানাবে।

মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে পুরুষদের উচিত, একান্ত নিকটাত্মীয় না হলে তাদের মহিলাদেরকে মড়াবাড়ি না নিয়ে যাওয়া, যেমন নিজে না গিয়ে মহিলাদেরকে পাঠানো (!) অনুচিত। কারণ, এসব ক্ষেত্রে (এবং বিবাহেও বিশেষ করে ঐ বাড়িতে শরয়ী পর্দার যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকলে) বেপর্দা হয়ে এবং মড়ার উপর ঝুটা কান্না কেঁদে মেয়েরা মাথায় করে পাপ নিয়েই ঘর ঢুকবে। অথচ পুরুষ গেলে জানাযা পড়ে দাফনাদি করে মড়াবাড়ির উপকার করবে এবং নিজেও নেকীর বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু 'যেখানে মেয়েই মরদ, সেখানে দ্বীনের কি দরদ?'

কিছু মহিলা আছে যারা মড়াবাড়ি আসা মাত্রই মাইয়্যেতের পরিজনের মহিলাদের গলা ধরে এমন সুর করে কান্না শুরু করে দেয় যে, তাতে উপস্থিত পুরুষরাও না কেঁদে পারে না। আরো কিছু মহিলা আছে যারা কুমীরের কান্না কাঁদে! অনেকে লজ্জার খাতিরে, লোক দেখিয়ে, নাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা বদনামের ভয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে ছন্দ বানিয়ে, কান্না না এলেও জোর করে কাঁদে। অথচ এসব যে কত নিকৃষ্ট স্বভাব তা বলাই বাহুল্য। পিয়ারা নবী ﷺ এমন মাতমকারিণী এবং শ্রোতা মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন। সুতরাং মহিলাদের জন্য এমন কর্ম করা অবশ্যই বৈধ নয়। যেমন, মাইয়্যেতের পরিজনদের উচিত, তাদেরকে এমন কান্নার সুযোগ না দেওয়া। মানা করা সত্ত্বেও যদি তারা বিরত না থাকে, তবে সম্ভব হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া উচিত। *(ঐ ৩৭পৃঃ)*

কোন কাফেরকে অনুরূপ সান্ত্বনা দিতে যাওয়া বৈধ নয়। আর বৈধ নয় তাদের কারো শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করা। কারণ, প্রত্যেক কাফের হল মুসলিমদের এক প্রকার শত্রু। আর শত্রুকে সান্ত্বনা বা কোনরূপ উৎসাহ প্রদান বৈধ হতে পারে না। যেমন, তাদের শেষক্রিয়ায় আমাদের অংশ গ্রহণ তাদের কোন উপকার দেবে না। কারণ, তাদের আত্মার কল্যাণার্থে দুআ করাই আমাদের জন্য হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴾

অর্থাৎ, নিকটাত্মীয় হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুসলিমদের জন্য সংগত নয়; যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী। *(সূরা তাওবাহ ১১৩ আয়াত)*

পক্ষান্তরে তারা যদি আমাদের বিপদের সময় আমাদেরকে সান্ত্বনা দিতে আসে, তাহলে তা গ্রহণ করতে পারি এবং বিনিময়ে তাদের জন্য হেদায়াতপ্রাপ্তির দুআ করতেও পারি। *(ঐ ৩৯পৃঃ)*

ঈসালে সওয়াব

মরণের পর মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষণে সকল ফসল বোনার সময় শেষ, এবারে বোনা ফসল কাটার সময়। যারা বোনার সময় গড়িমসি করে কাটিয়েছে তারা এখানে এসে দেখবে, তাদের জমিতে ফসল নেই। রয়েছে জমিভরা আগাছা অথবা আগছা মিশ্রিত ফসল। তাদের জন্য রয়েছে বড় আক্ষেপ, কবরের ফিতনা ও আযাব।

আগুনের মাঝে অথবা বন্যা স্রোতের মাঝে পড়ে যেমন কোন মানুষ বাঁচার জন্য আকুল ফরিয়াদ করে, তেমনি কবরে গিয়ে পাপী মানুষও যেন সাহায্যের আশায় চেয়ে থাকে। জীবিত আত্মীয়-স্বজনরা তাদের যথার্থ সাহায্য সামগ্রী নিয়ে তাকে সহায়তা করতে পারে।

অবশ্য সেই সাহায্য পাঠাতে হবে সরকারী ডাকে এবং সরকারী নিয়মে। নচেৎ বেসরকারী ডাক ও নিয়মে সাহায্য পাঠালে তা সঠিক ঠিকানায় না পৌঁছে 'মেহনত বরবাদ ও গোনাহ লাযেম' হয়ে যাবে। আবার যেখানে 'দই'এর প্রয়োজন সেখানে 'খই' অথবা 'চুন' পাঠালে সাহায্যপ্রার্থী কোন উপকার পাবে না।

মৃত ব্যক্তি যে সব আমল দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ-

১। মুসলিম তার সেই মধ্যজগৎ হতে আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভায়ের দুআয় উপকৃত হয়ে থাকে। দুআ কবুলের সমস্ত শর্ত পূর্ণ থাকলে নিশ্চয় সে

দুআ তার কাজে দেবে। কুরআন মাজীদে মৃতের জন্য দুআর কথা উল্লেখ হয়েছে ; আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴾

অর্থাৎ,---যারা ওদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী (বিগত) আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। *(সূরা হাশ্‌র ১০ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ ও মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করেছেন। যেমন, জানাযার নামায ও কবর যিয়ারতের বিভিন্ন দুআ এ কথার সাক্ষী। যার প্রায় সবটাই মাইয়্যেতের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনায় পূর্ণ। পরন্তু মহানবী ﷺ এ কথাও বলেছেন, "মুসলিম ব্যক্তির কোন ভায়ের জন্য তার অদৃশ্যে থেকে দুআ কবুল হয়। দুআকারীর মাথার উপর এক ফিরিশ্তা নিয়োজিত থাকেন। যখনই দুআকারী তার (অদৃশ্য বা অনুপস্থিত) ভায়ের জন্য দুআ করে, তখনই উক্ত ফিরিশ্তা বলেন, 'আমীন। আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম ২৭৩৩, আবু দাউদ ১৫৩৪নং প্রমুখ)*

২। মাইয়্যেতের নযর-মানা রোযা যদি তার অভিভাবক কাযা রেখে দেয়, তবে তার সওয়াব তার উপকারে আসবে।

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "ব্যক্তি রোযা কাযা রেখে মারা যায় সে ব্যক্তির তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।" *(বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭নং, প্রমুখ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'এক মহিলা সমুদ্র-সফরে বের হলে সে নযর মানল যে, যদি আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দান করেন, তাহলে সে একমাস রোযা রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু রোযা না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কন্যা নবী ﷺ এর নিকট এসে সে ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "মনে কর, তার যদি কোন ঋণ বাকী থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না?" বলল,

'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ-যোগ্য। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের তরফ থেকে রোযা কাযা করে দাও।" *(আবূ দাউদ ৩৩০৮নং, আহমাদ ২/২১৬ প্রমুখ)*

তদনুরূপ রমযানের রোযা কাযা করে মারা গেলে তার বিনিময়ে তার অভিভাবক ফিদয়্যাহ (প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একটি মিসকীনকে একদিনের খাদ্য অথবা ১ কিলো ২৫০ গ্রাম করে চাল) দিলে তার সওয়াবও মাইয়্যেতের জন্য উপকারী।

আমরাহর মা রমযানের রোযা বাকী রেখে ইন্তিকাল করলে তিনি মা আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আমার মায়ের তরফ থেকে কাযা করে দেব কি?' আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'না। বরং তার তরফ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক একটি মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় ১কিলো ২৫০ গ্রাম খাদ্য) সদকাহ করে দাও।' *(ত্বাহাবী ৩/১৪২, মুহাল্লা ৭/৪, আহকামুল জানাইয, টীকা ১৭০পৃঃ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'কোন ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তারপর রোযা না রাখা অবস্থায় মারা গেলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে; তার কাযা নেই। পক্ষান্তরে নযরের রোযা বাকী রেখে গেলে তার তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।' *(আবূ দাউদ ২৪০১নং প্রমুখ)*

৩। মাইয়্যেতের তরফ থেকে আত্মীয় বা যে কেউ তার ছেড়ে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করলে সে কবরে উপকৃত হয়। এ ব্যাপারে পুস্তিকার শুরুর দিকে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪। মাইয়্যেত হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেলে, অথবা হজ্জ ফরয হওয়ার পর কোন ওযরে না করে মারা গেলে যদি তার ওয়ারেসীনদের কেউ (যে নিজের ফরয হজ্জ আগে পালন করে থাকবে) তার তরফ থেকে তা পালন করে তবে এর সওয়াবেও সে লাভবান হবে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার বোন হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেছে। (এখন কি করা যায়?) নবী ﷺ বললেন, "তার ঋণ বাকী থাকলে কি তুমি পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য।" *(বুখারী ৬৬৯৯নং)*

অনুরূপ এক মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বা বড় বৃদ্ধ। তার ফরয হজ্জ বাকী আছে। এখন সওয়ারীতে বসে থাকতেও সে অক্ষম। আমি কি তার তরফ থেকে হজ্জ করে দেব?' নবী ﷺ বললেন, " 'হ্যাঁ।' করে দাও।" *(মুসলিম ১৩৩৪- ১৩৩৫নং প্রমুখ)*

ইমাম নওবী বলেন, এই হাদীস বার্ধক্য, চিররোগ অথবা মৃত্যুর কারণে ফরয হজ্জ পালনে অসমর্থ ব্যক্তির তরফ থেকে হজ্জ পালন করার বৈধতা নির্দেশ করে। *(শারহে নওবী ৫/৮৩)*

অবশ্য ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে বিনা ওজরে সময়ের অবহেলা করে হজ্জ না করে মারা গেছে তার তরফ থেকে হজ্জ আদায় কোন কাজে দেবে না। *(আহকামুল জানাইয ১৭১পৃঃ, টীকা)*

৫। মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তান যে নেক আমল করে তার সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব লাভ হয় তার পিতা-মাতারও। এতে সন্তানের সওয়াবও মোটেই কম হয় না। কারণ, সন্তান হল পিতা-মাতার আমলকৃত ও উপার্জিত ধনের ন্যায়। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾

অর্থাৎ, এবং মানুষ তাই পায়; যা সে করে। *(সূরা নাজ্ম ৩৯ আয়াত)*

আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, "মানুষ সবচেয়ে হালাল বস্তু যেটা ভক্ষণ করে তা হল তার নিজ উপার্জিত খাদ্য। আর তার সন্তান হল তার নিজ উপার্জিত ধন স্বরূপ।" *(আবূ দাউদ ৩৫২৮, তিরমিযী ১৩৫৮, নাসাঈ ৪৪৬৪, ইবনে মাজাহ ২১৩৭নং প্রমুখ)*

তাই সন্তান যদি তার পিতা-মাতার নামে দান করে অথবা ক্রীতদাস মুক্ত করে অথবা হজ্জ করে, তাহলে এসবের সওয়াবে তারা উপকৃত হবে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সা'দ বিন উবাদাহর মা যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার অনুপস্থিত থাকা কালে আমার আম্মা মারা গেছেন। এখন যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু দান করি তাহলে তিনি উপকৃত হবেন কি?' নবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ হবে।" সা'দ বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফের বাগান তাঁর নামে সদকাহ করলাম।' *(বুখারী ২৭৫৬নং প্রমুখ)*

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বলেন, আস বিন ওয়াইল সাহমী তার তরফ হতে ১০০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার অসিয়ত করে মারা যায়। সুতরাং তার ছোট ছেলে হিশাম ৫০টি দাস মুক্ত করে। অতঃপর তার বড় ছেলে আম্র বাকী ৫০টি দাস মুক্ত করার ইচ্ছা করলে বললেন, '(বাপ তো কাফের অবস্থায় মারা গেছে) তাই আমি এ কাজ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না করে করব না।' সুতরাং তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি বাকী ৫০টি দাস তার তরফ থেকে মুক্ত করব?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "সে যদি মুসলিম হতো এবং তোমরা তার তরফ থেকে দাস মুক্ত করতে, অথবা সদকাহ করতে অথবা হজ্জ করতে তাহলে তার সওয়াব তার নিকট পৌঁছত।" *(আবূ দাউদ ২৮৮৩নং, বাইহাকী ৬/ ২৭৯, আহমাদ ৬৭০৪নং)*

৬। মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া স্বকৃত প্রবাহমান ইষ্টাপূর্ত কীর্তিকর্ম (সাদকায়ে জারিয়াহ); যেমন, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ , কল-কুঁয়া প্রভৃতি তৈরী, উপকারী গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতি; যে সব কীর্তির উপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী বহমান থাকে- সে ধরনের নিজের কর্মফল মৃত মধ্যজগতেও ভোগ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾

অর্থাৎ, আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম আর যে কীর্তিসমূহ পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি। *(সূরা ইয়াসীন ১২আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষ মারা গেলে তিনটি জিনিস ছাড়া তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সদকাহ জারিয়াহ, ফলপ্রসূ ইল্ম (শিক্ষা) এবং নেক সন্তান; যে তার জন্য দুআ করে।" *(মুসলিম ১৬৩১, আবূ দাউদ ২৮৮০, নাসাঈ ৩৬৫৩নং প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "মরণের পরেও মুমিনের যে আমল ও নেকী তার সাথে মিলিত হয় তা হল; এমন ইল্ম যা সে শিক্ষা করেছে এবং প্রচার করেছে, তার ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তানও মুসহাফ (কুঅরান শরীফ), তার নির্মিত মসজিদ ও মুসাফির খানা, তার খননকৃত নালা বা ক্যানেল এবং তার মালের সদকাহ যা সে তার সুস্থ ও জীবিত থাকা অবস্থায় দান করে গেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২নং)*

এ কথা স্পষ্ট যে, নিজের হাতে করে যাওয়া নেকীতেই লাভের আশা করা

যায়। তাছাড়া অপরে যে ঠিকমত ঈসালে সওয়াব করবে তার ভরসা কোথায়?

পক্ষান্তরে অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ঈসালে সওয়াব করলে তা বেসকারী ডাকে ইরসাল হবে যা সঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে না। সুতরাং মাইয়্যেতের তরফ থেকে তওবা করা, নামায পড়া, নিজের অথবা ভাড়াটে ক্বারীদের কুরআনখানী, ফাতিহাখানী, কুলখানী, শবীনা পাঠ, চালশে, চাহারম, নিয়মিত বাৎসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোন মতেই ঈসাল বা 'রিসিভ্ড্' হবে না। *(আহকামুল জানাইয, মু'জামুল বিদা' ১৩৫পৃঃ)*

উল্লেখ্য যে, ঈসালে সওয়াবের জন্য দান খয়রাত বা দুআর জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন, ক্ষণ বা মজলিস নেই। নির্দিষ্ট দিনে অথবা জুমআহ, ঈদ বা তথাকথিত শবেবরাতের দিন বা রাতে বিশেষ করে সাদ্কা বা দুআ করা অথবা এর জন্য লোক জমায়েত করে মজলিস করা বিদআত।

অনুরূপভাবে মাইয়্যেত জীবিতকালে যে জিনিস খেতে অধিক পছন্দ করত সেই জিনিসই বিশেষ করে সদকা করা বিদআত।

অনেকে ফাতেহাখানী, কুরআনখানী প্রভৃতি করে তার সওয়াব তাঁদের জন্য (যেমন আম্বিয়াদের নামে) বখশে দেয় -যাঁরা সওয়াবের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং এমন কাজ বিদআত ও ফালতু বৈ কি?

কবর যিয়ারত

'আমার সমাধি দুয়ারে বারেক দাঁড়াও পান্থবর,
জগৎ ছাড়িয়া আসিয়া আমি কি হয়েছি এমন পর।'

জাগতিক জীবনের মূল্যহীনতা প্রসঙ্গে ধারণা ও উপদেশ গ্রহণ, মৃত্যু, আখেরাত বা পরকালকে স্মরণ এবং মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত বিধেয়। তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে যে, সেখানে গিয়ে এমন কথা বলা হবে না যাতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন; যেমন, মৃতব্যক্তির নিকট ফরিয়াদ করা, তার কাছে কিছু চাওয়া, তার মিথ্যা প্রশংসা করা, সে 'জান্নাতী' বলে পাক্কা ধারণা করা ইত্যাদি।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "(কবরের ধারে-পাশে এবং মৃতদেরকে নিয়েই শির্ক ও

মূর্তিপূজা শুরু হয়েছে বলে) আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কারণ, তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম ৯৭৭, আবূ দাউদ ৩২৩৫নং, আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫)* "তোমাদের কবর যিয়ারত যেন তোমাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করে।" *(আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫ প্রমুখ)* "সুতরাং যে ব্যক্তি যিয়ারত করার ইচ্ছা করে সে করতে পারে; তবে যেন (সেখানে) তোমরা অশ্লীল ও বাজে কথা বলো না।" *(নাসাঈ ২০৩২নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। শোনো! এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। কারণ, কবর যিয়ারত হৃদয় নম্র করে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে (যিয়ারতে গিয়ে) বাজে কথা বলো না।" *(হাকেম ১/৩৭৬, আহমাদ ৩/২৩৭-২৫০)*

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত বিধেয় নয়। কারণ, তাদের এমনিতেই ধৈর্য ও সহ্য শক্তি কম। তাছাড়া তারা শরীয়ত-বিরোধী কাজ অধিক করতে পারে যিয়ারতে গিয়ে। যেমন; চেঁচামেচি ও উচ্চস্বরে কান্না করবে, পর্দাহীনতার সাথে যিয়ারতে যাবে, অভ্যাসগতভাবে কবরস্থান বেড়াতে যাবে। (পার্ক মনে করে নেবে।) সেখানে বসে ফালতু আড্ডা দিয়ে বাজে কথাবার্তা বলবে। কিছু মুসলিম দেশে এর বাস্তব উদাহরণ বর্তমান। তাই তো পিয়ারা নবী ﷺ অধিক কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। *(তিরমিযী ১০৫৬, ইবনে মাজাহ ১৫৭৪নং)*

অবশ্য সকল প্রকার আদবের সাথে মহিলারা কখনো কখনো কবর যিয়ারত করতে পারে। তাতে বহু উলামার নিকট অনুমতি রয়েছে এবং তার দলীলও বর্তমান। তবে বেশী করলে তারা অভিসম্পাতে শামিল হবে। *(দেখুন, আহকামুল জানাইয ১৮০- ১৮৭পৃঃ)*

কেবল উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অমুসলিমের কবর যিয়ারত করা বৈধ। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা নবী তাঁর আম্মার কবর যিয়ারত করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর আশে-পাশে সকলকে কাঁদিয়ে তুললেন। (কারণ, জিজ্ঞাসা করা হলে) তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর নিকট আমার আম্মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। অতঃপর আমি তাঁর নিকট তাঁর কবর যিয়ারত করতে অনুমতি

চাইলে তিনি তাতে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ, তা মরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম ৯৭৬, আবূ দাউদ ৩২৩৪, নাসাঈ ২০৩৩, ইবনে মাজাহ ১৫৭২নং)*

বলা বাহুল্য, তার জন্য দুআ করা বা তাকে সালাম দেওয়া যায় না। বরং কাফেরদের কবরের পাশ দিয়ে গেলেই তাদেরকে নরকের সুসংবাদ দেওয়া বা তারা নরকবাসী হয়েছে এই ধারণা করা উচিত। *(ত্বাবারানী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৭৬৩নং)*

তদনুরূপ রহমত ও ক্ষমার দুআ করে মাইয়্যেতকে উপকৃত করাও কবর যিয়ারতের এক মহান উদ্দেশ্য। তবে দুআ হবে কেবল মুসলিমদের জন্য।

মা আয়েশা ﵂ বলেন, নবী ﷺ বাকীর দিকে বের হতেন এবং (সেখানকার) কবরবাসীর জন্য দুআ করতেন।

এ ব্যাপারে মা আয়েশা ﵂ তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন, "তাদের জন্য দুআ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি।" *(আহমাদ ৬/২৫২)*

কবর যিয়ারতের দুআ

সুন্নাহতে কবর যিয়ারতের কয়েক প্রকার দুআ বর্ণিত হয়েছেঃ-

১- B ঃ8 kl ?+ B $- $ " # ! F kl 6 m) W‘ @ #n & $HR

’B 2 K #n1b QA B "

উচ্চারণঃ- আসসালামু আলাইকুম আহলা দা-রি ক্বাওমিম মুমিনীন, অ আতাকুম মা তূআদূনা গাদাম মুআজ্জালূন। অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লাহিক্বুন।

অর্থঃ- তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিন কবরবাসী কওম! তোমাদের নিকট তা চলে এসেছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, আগামী কাল (কিয়ামত) পর্যন্ত (বিস্তারিত পুরস্কার ও শাস্তি) বিলম্বিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ চাইলে আমরাও তোমাদেরই সাথে মিলিত হব। *(মুসলিম ৯৭৪নং)*

২- b QA B " F (&R$ F k$ F) G ‘@#n & $HR

’] M $n h i JR B 2 H #n1

উচ্চারণঃ- আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল মু’মিনীনা অলমুসলিমীন, অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিক্বুন, নাসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আ-ফিয়াহ।

অর্থ- তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! আমরাও -আল্লাহ যদি চান- তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ২/৬৭১)*

৩- b $ C F (&R$ F k$ F) G ‘@, & $HR

’B 2 H #n1b QA B " FC J5R$ " F ?25R$

উচ্চারণঃ- আসসালা-মু আলা আহলিদ্দিয়া-রি মিনাল মু’মিনীনা অলমুসলিমীন, অ য়্যারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না অলমুস্তা’খিরীন, অইন্না ইনশা-ল্লা-হু বিকুম লালা-হিক্বুন।

অর্থঃ- মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যারা আগে এসেছে এবং যারা পরে আসবে তাদের উপর আল্লাহ রহম করেন। এবং আমরাও আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব। *(মুসলিম ৯৭৮-নং)*

৪। qpB 2 K #n1b QA B " F kl 6 m) W#n & $HR pp

উচ্চারণঃ- আস্‌সালামু আলাই কুম দারা কাওমিম মু’মিনীন, অইন্না ইন শা-আল্লাহু বিকুম লা-হিক্বুন।

অর্থঃ- তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ হোক হে মুমিন কবরবাসী দল। আল্লাহ চাইলে আমরা তোমাদেরই সাথে মিলিত হব। *(মুসলিম ২৪৯, মালেক ১/৪৯-৫০, নাসাঈ ১৫০, ইবনে মাজাহ ৪৩০৬, আহমাদ ২/৩০০,৪০৮ প্রমুখ)*

কবর যিয়ারতে গিয়ে কুরআন মাজীদ বা তার কোন অংশ পাঠ করা বিধেয় নয়। বিধেয় হলে মহানবী ﷺ তা করে যেতেন। পক্ষান্তরে মা আয়েশা (রাঃ)

যখন মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'কবর যিয়ারত করলে আমি কি বলব?' তখন মহানবী ﷺ তাঁকে দুআ শিক্ষা দিলেন; কুরআনের কোন আয়াত পড়ার কথা শিক্ষা দিলেন না। *(দেখুন, মুসলিম ৯৭৪নং প্রমুখ)*

কবরস্থানে কুরআন পড়া যে বৈধ নয় সে কথা নবী ﷺ-এর নিম্নের বাণীও নির্দেশ করে; তিনি বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহকে কবরস্থান করে রেখো না। (সুতরাং তোমরা গৃহে কুরআন পাঠ কর।" *(মুসলিম ৭৮০, তিরমিযী ২৮৭৭নং, আহমাদ ২/২৮৪)*

কবর যিয়ারত করতে গিয়ে মওতাদের জন্য (একাকী) হাত তুলে দুআ করা বিধেয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাত্রে নবী ﷺ বাড়ি হতে বের হলে গেলেন। তিনি কোথায় গেলেন তা দেখার জন্য আমি (দাসী) বারীরাহকে তাঁর পশ্চাতে পাঠালাম। বারীরাহ দেখল, তিনি বাকী'তে গিয়ে নিচের দিকে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন। অতঃপর ফিরে এলেন। বারীরাহ আমাকে সে খবর দিল। সকালে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাত্রে আপনি কোথায় বের হয়েছিলেন?' বললেন, "বাকী'তে গিয়ে সেখানকার কবরবাসীর জন্য দুআ করতে যেতে আমি আদিষ্ট হয়েছিলাম।" *(আহমাদ ৬/৯২, মালেক ১/২৩৯-২৪০)*

মুসলিম শরীফ প্রভৃতির এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি নিজে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে দেখলেন, বাকী'তে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দন্ডায়মান থাকলেন। অতঃপর তিন বার হাত তুললেন। *(মুসলিম ৯৭৪নং)*

অবশ্য মওতার জন্য দুআ করার সময় কবরসমূহকে সম্মুখ করা বৈধ নয়। বরং কেবলাহ মুখেই দুআ করতে হবে। কারণ মহানবী ﷺ কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম, মিশকাত ১৬৯৮নং)* আর দুআ হল নামাযের মগজ ও মূল বস্তু। অতএব দুআরও নির্দেশ নামাযের মতই। নবী করীম ﷺ বলেন, "দুআই হল ইবাদত।" *(আবূ দাউদ ১৪৭৯, তিরমিযী ৩৩৭২, ইবনে মাযাহ ৩৮২৮, আহমাদ ৪/২৬৭)*

কবর যিয়ারত করার জন্য কোন নির্ধারিত দিন-কাল নেই। নির্দিষ্ট করে ঈদের দিন বা জুমআর দিন (পিতা-মাতার) কবর যিয়ারত করা এবং তদনুরূপ শবেবরাত (?) এর দিন বা রাতে যিয়ারত করা ও কবরের উপর বাতি জ্বালানো বিদআত।

তেমনি দাফনের পর দিন হতে শুরু করে কয়েক সকাল নতুন কবর যিয়ারত

করা ও তারপর ত্যাগ করে দেওয়া বিধেয় নয়। কেবল কয়েক সকাল এবং নতুন কবর নির্দিষ্ট করা বিদআত।

মুসলিমদের কবরসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে (কবরের ফাঁকে ফাঁকে) জুতা পরে চলা বৈধ নয়।

বাশীর বিন হানযালাহ বলেন, 'একদা আমি নবী ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। চলতে চলতে কবরস্থানে এলে তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি পায়ে জুতো পরেই কবরের ফাঁকে ফাঁকে চলছে। তা দেখে তিনি বললেন, "হে লোমহীন জুতা-ওয়ালা! তোমার জুতা খুলে ফেল।" লোকটি তাকিয়ে দেখে নবী ﷺ-কে চিনতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গে জুতা খুলে দূরে ছুঁড়ে দিল। *(আবূ দাউদ ৩২৩০, নাসাঈ ২০৪৭, ইবনে মাজাহ ১৫৬৮ নং)*

অবশ্য কোন কার্যক্ষেত্রে কবরের মাঝে-মাঝে যেতেই হলে এবং মাটি অত্যধিক গরম থাকলে অথবা কাঁটায় পা ক্ষত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে জুতো পরে যাওয়া প্রয়োজনে বৈধ। *(সাবউনা সুআলান ৪৮ পৃঃ)*

যেমন বৈধ নয়, কবরের উপর বেয়ে চলা, কবরের উপর বসা, কবরের উপর দিয়ে সাধারণ রাস্তা তৈরী করা, কবরের উপর কোন প্রকার নোংরাদি ফেলা, কবরের মাটিতে ফসল উৎপাদন করা, নিজের কাজে ব্যবহার করা, তার উপর কোন প্রকার খেলা, পুরানো কবর স্থানকে খেলার মাঠ করা ইত্যাদি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো কোন কবরকে (পদদলিত করা অথবা তার) উপর বসা অপেক্ষা আঙ্গারের উপর বসে কাপড় পুড়ে চামড়া পুড়ে যাওয়া উত্তম।" *(মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী ৪/৭৯, আহমাদ ২/৩১১ ইত্যাদি)*

এই জন্যই -পদদলন ও অসম্মানের হাত হতে হিফাযতের উদ্দেশ্যে - কবরস্থানের চতুঃসীমা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ওয়াজেব।

যিয়ারতে গিয়ে কবর স্পর্শ করা, স্পর্শ করে গায়ে হাত ফিরানো, কবর চুম্বন করা, কবরের (মাযারের) গায়ে গাল, বুক পেট ইত্যাদি লাগিয়ে তাবার্রুক গ্রহণ, কবর তাওয়াফ করা, কবরকে পিছন না করা, কবর স্থানে প্রবেশ করে উল্টপায়ে বের হওয়া, কবরের মাটিতে আরোগ্য আছে মনে করা ও তা খাওয়া বা ব্যবহার করা, কোন নেক ব্যক্তির কবরের পাশে দুআ করলে তা কবুল হবে মনে করা এবং সেই আশায় দুআ করা, কবরস্থ ব্যক্তিকে অসীলা করে দুআ

করা, কবরের সামনে ঝুঁকা ও সিজদা করা (!) নামাযের মত দুই হাত বুকে বেঁধে বিনয়ের সাথে খাড়া হওয়া, কবরবাসীর নামে ফাতেহা পড়া, তার নিকট প্রয়োজন ভিক্ষা করা, চিরকুটে আবেদন লিখে কবরের উপর বা পাশে ফেলা, কোন কবর যিয়ারতে হজ্জের সমান নেকী আছে মনে করা বা, কোন ওলীর কবর যিয়ারতকে গরীবদের হজ্জ ধারণা করা, কবরের উপর পুষ্পার্ঘ দান, চাদর চড়ানো, আতর ছড়ানো, মিষ্টি বিতরণ, কবরকে মসজিদ বানানো, ঈদ বা খুশীর মিলন ক্ষেত্র বানানো, কবরের উপর উরস বা মেলা করা, বাদ্য ও নৃত্য-গীতের সমারোহ করা, কবরের উদ্দেশ্যে দূর থেকে সফর করা, কবরের নিকট বা উপরে বাতি ও ধূপধূনো দেওয়া, মাটির হাতি-ঘোড়া পেশ করা , নযর-নিয়ায মানা ও পেশ করা হারাম, বিদআত ও শির্ক। *(আহকামুল জানাইয দ্রষ্টব্য)*

কোন যিয়ারতকারীর মাধ্যমে নবী বা ওলীগণের কবরে সালাম পাঠানো, কবরস্থানের গাছপালাকে পবিত্র জ্ঞান করা এবং তার ডাল-পাতা না ভাঙ্গা। আর ভাঙ্গলে কোন অমঙ্গল হবে এই আশঙ্কা করা, কবরের দিকে সম্মুখ করে নামায পড়া, (যদিও কিবলা ঐ দিকে) কবরগাহে বা মাযারের নিকট নামায পড়া বা কোন ইবাদত করা বিদআত ও অবৈধ। যেহেতু কবরস্থানে বা যে মসজিদে কবর আছে সে মসজিদে নামায হয় না। পড়লে পুনঃ পড়া ওয়াজেব। *(তাহযীরুস সাজিদ দ্রষ্টব্য)*

পরিশেষে আল্লাহ আমাদেরকে বিদআতের সকল প্রকার অন্ধকার থেকে দূরে সরিয়ে সুন্নাহর আলোক সজ্জিত পথ প্রদর্শন করুন। সমগ্র মুসলিম জাহানকে শির্কের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিয়ে তওহীদের উন্মুক্ত ও অনাবিল নির্ঝরে পরিপ্লুত করুন। যাতে মরণের সময় যেন সকলে মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। আমীন।

﴿ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ﴾

﴿ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَتَوَفَّنَا مُسۡلِمِينَ ﴾

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.